দাম : দশ টাকা

# স্বস্তিকা

একাত্ম মানববাদ
দর্শন ও উনিশ শতকের
বঙ্গ মনীষী
— পৃঃ ১৮

লোকসংগঠনের
প্রাচীন পরম্পরার
পুনরুজ্জীবন
ঘটছে
— পৃঃ ৩২

৬৮ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।। ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।। ১৭ মাঘ - ১৪২২।। যুগাব্দ ৫১১৭।। website : www.eswastika.com ।।

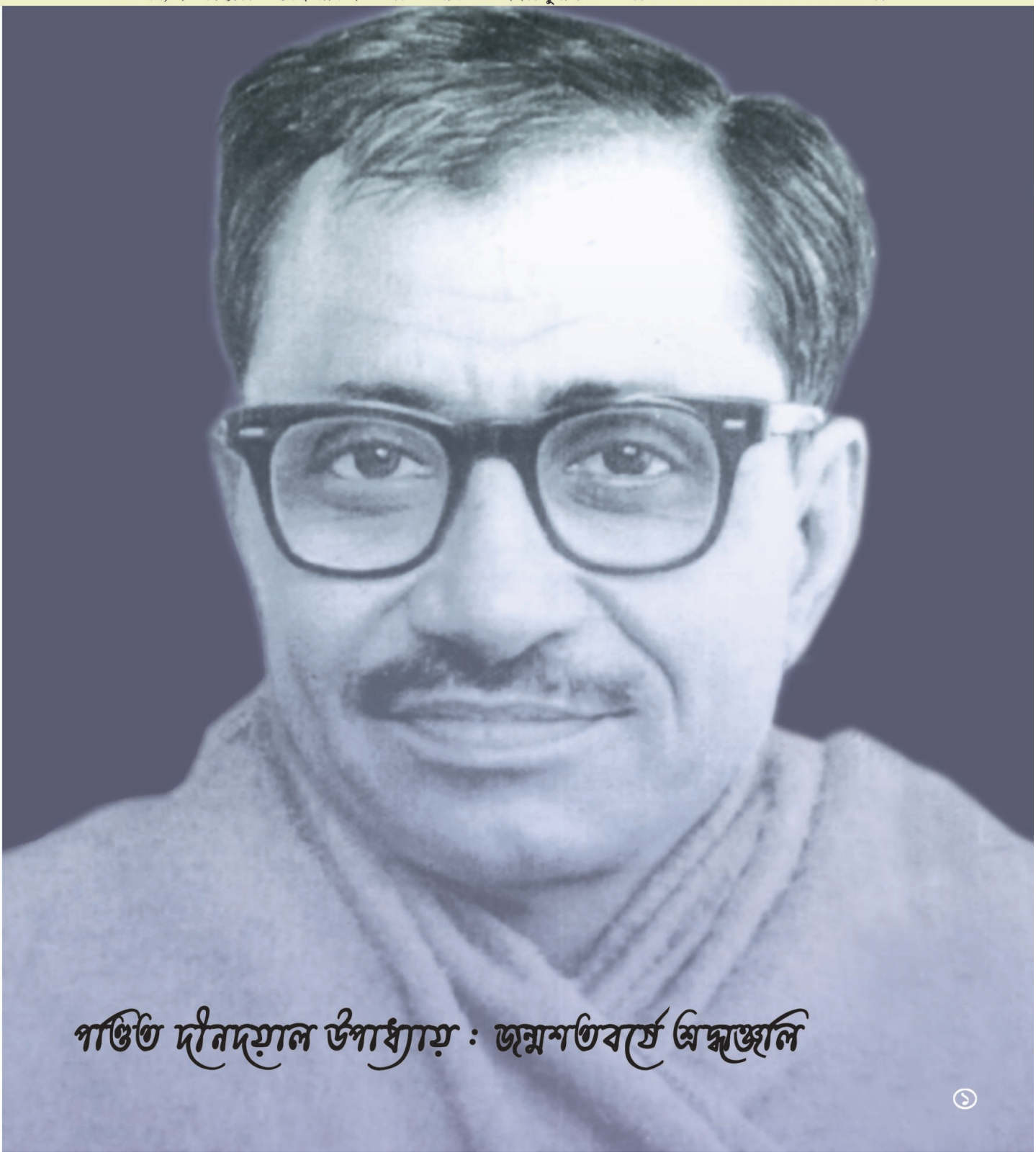

## পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় : জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

# স্বস্তিকা

*।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।*

৬৮ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ১৭ মাঘ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

১ ফেব্রুয়ারি - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

**সম্পাদক : বিজয় আঢ্য**

**সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল**

**প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত**

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

**দাম : ১০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।**

**Postal Registration No.**

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

# সূচীপত্র

**সম্পাদকীয়** ▯ ৫

**সংবাদ প্রতিবেদন** ▯ ৬-৯

**খোলা চিঠি : মদন-মুকুল-আরাবুল ফিরে এল বিলকুল** ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১০

**বাম-কংগ্রেস সমঝোতা এবং নীতিহীন আঁতাত** ▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ১১

**পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়-তর্পণে ভাউরাও দেওরস** ▯ সংকলক : রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক ▯ ১৩

**রাজনীতির নিখাদ সোনা দীনদয়াল উপাধ্যায়** ▯ তাপস দত্ত ▯ ১৬

**একাত্ম মানবদর্শন ও ঊনিশ শতকের বঙ্গ মনীষী** ▯ অমলেশ মিশ্র ▯ ১৮

**অঙ্ককষা নৈতিকতার বাণী জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে** ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ২২

**প্রাচীন প্রত্ন-ক্ষেত্র ও শৈবতীর্থ এক্তেশ্বর** ▯ বিপ্লব বরাট ▯ ২৭

**বড় ধরনের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে আসন্ন বাজেটের কয়েকটি দিকনির্দেশ** ▯ এন ভি কৃষ্ণকুমার ▯ ৩০

**লোক সংগঠনের প্রাচীন পরম্পরার পুনরুজ্জীবন ঘটছে** ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ৩২

**নিয়মিত বিভাগ**

**চিঠিপত্র : ২১** ▯ **অন্যরকম : ২৩** ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৮** ▯ **খেলা : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১** ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

# স্বস্তিকা

## আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

## সরকার সৌরশক্তিকে কতটা কাজে লাগাচ্ছে?

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাদশ ও দ্বাদশ পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রক পরিষ্কার করে বলেছিল, বৃদ্ধি ঘটাতে হবে অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের। অর্থাৎ বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি এবং বায়ুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়নের গতিকে তরান্বিত করতে হবে। বিগত কয়েক বছরে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ প্রমুখ রাজ্যগুলি সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। কেন্দ্রীয় সরকার এজন্য বহু কোটি টাকা ভরতুকিও দিয়েছে রাজ্যগুলিকে। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান কী এবং কেন্দ্রের মোদি সরকারেরই বা পরিকল্পনা কী— এই প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অভিজিৎ মুখার্জী, নবকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ।

**দাম একই থাকছে ১০ টাকা।। সত্বর কপি বুক করুন।।**



## বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

*নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।*

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫



## সানরাইজ®
## সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

**স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।**

# সম্পাদকীয়

## নেতাজী সংক্রান্ত ফাইল

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২০তম জন্মদিবসের পুণ্যতিথিতে নেতাজী সংক্রান্ত ১০০টি গোপন নথি প্রকাশ হইয়াছে। নেতাজীর অন্তর্ধান লইয়া সরাসরি জানা না যাইলেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্র বা ইঙ্গিত এই ফাইলে মিলিয়াছে। যাঁহারা এতদিন বলিয়াছিলেন, ফাইল প্রকাশ হইলে দেশে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হইবে, আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের মুখ পুড়িবে, অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হইবে ইত্যাদি; তাঁহারা এইসব কিছু হইল না দেখিয়া নিজেদের মুখ লুকাইতে এবং পিঠ বাঁচাইতে অন্য কৌশল অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিবেন। অমর্ত্য সেন ইতিমধ্যেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে নেতাজী ফাইল লইয়া অহেতুক উত্তেজনা চলিতেছে। নেতাজীর জীবনের অবদান, তাঁহার আদর্শটাই খাঁটি জিনিস। তিনি কীভাবে মারা গিয়াছেন ইহার গুরুত্ব সামান্য। অথচ এই অমর্ত্য সেনই সাহিত্যিক কলবর্গির মৃত্যু লইয়া সরব হইয়াছেন, তখন কিন্তু বলিতেছেন না তিনি কীভাবে মারা গিয়াছেন তাহার গুরুত্ব সামান্য। অমর্ত্য সেনদের এই দ্বিচারিতায় কংগ্রেসের বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। ১৯৫৮ সালে এক প্রশ্নের জবাবে নেতাজীর ভাই সুরেশচন্দ্র বসুকে নেহরু স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, নেতাজী তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন এইরকম কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ সরকারের কাছে নাই। কিন্তু ঘটনা হইল ১৯৫২ সালে নেহরুই সংসদে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন বিমান দুর্ঘটনাতেই নেতাজী মারা গিয়াছেন সেই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। এখন প্রশ্ন হইল, নেহরুর ঠিক কথাটি কি? আসলে নেহরু ভালোভাবেই জানিতেন বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয় নাই। ক্ষমতা ও প্রধানমন্ত্রিত্ব টিকাইয়া রাখিতে নেতাজীর জীবিত থাকা লইয়া তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই তাঁহার মৃত্যুর খবর জোর গলায় সমর্থন করিতেন। চাহিতেন এই বিষয় লইয়া যাহাতে হৈচৈ না হয়। নেহরু যে মিথ্যে বলিতেন তাহা আজ প্রমাণিত। স্বাধীন ভারতে নেতাজীর পরিবারের সব সদস্যের উপর ভারতীয় গোয়েন্দাদের নজরদারি চালাইবার সংবাদ এখন প্রমাণিত সত্য। যদি নেতাজী মারা গিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবারের উপর নজরদারি চলিত কেন? আসলে কংগ্রেস নেতাজী ইস্যু ধামাচাপা দিতে চাহিয়াছিল এবং এখনও চাহিতেছে। তাহাদের মুখোশ খুলিয়া পড়িবার আশঙ্কায় তাহারা আতঙ্কিত। তাই নানাভাবে চেষ্টা চালাইতেছে। উল্লেখ্য, এই প্রথম ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী নেতাজী সম্বন্ধীয় গোপন ফাইল প্রকাশ করিলেন। প্রথমে ১০০টি ফাইল প্রকাশ করিলেন এবং প্রতি মাসে কয়েকটি করিয়া ফাইল প্রকাশ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। এই ফাইল প্রকাশ হইলে স্বার্থান্বেষী মহল বিপদে পড়িবে তাই চেষ্টা চলিতেছে বিতর্কের। মনে রাখিতে হইবে নেতাজী পরিবারের অনেককেই সাংসদ করা হইয়াছে এবং জাতীয় স্বার্থের বিনিময়ে তাঁহাদের মুখ বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ফাইলগুলি প্রকাশ হইলে কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লকের মুখোশ খুলিয়া পড়িবে। আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাশিয়ার ফাইল চাই বলিয়া দাবি তুলিতেছেন, কিন্তু তাঁহার দলের সাংসদ এবং নেতাজী পরিবারের একজনও এই দাবি তোলেন নাই। উল্লেখ্য, কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট থাকিবার কালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে নিশ্চুপ ছিলেন, বরঞ্চ সেদিনের বিজেপি সাংসদের নেতাজী অন্তর্ধান লইয়া দাবির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ এই কারণেই বলিয়াছেন, ফাইল লইয়া আগ্রহ না দেখাইবার জন্য নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে ১০০ কোটি টাকা দিয়াছিল নেহরু পরিবার। ঘটনা হইল নেতাজী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় লোপাট হইয়া গিয়াছে কংগ্রেসের অপচেষ্টায়। তবে যেটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা প্রকাশ হইলেও অনেকের মুখোশ খুলিয়া যাইবে।

## সুভাষিতম্

ভদ্রং ভদ্রং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
বক্তারো দর্দুরা যত্র তত্র মৌনং হি শোভতে।।

বসন্তকালে কোকিল সুমধুর গান গায় কিন্তু বর্ষাকালে যখন ব্যাঙ ডাকে, কোকিল তখন চুপ করে থাকে। দুর্জন যখন কথা বলে তখন সুজনের চুপ করে থাকাই শোভা পায়।

# ভারতে জঙ্গি জাল বিছোতে সোশ্যাল মিডিয়াকে টার্গেট আই এসের

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** গণতন্ত্র দিবসের আগে ছয় আই এস সহানুভূতিশীল এবং সেইসঙ্গে আই এসের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করলো জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এন আই এ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি)। গত ২২ জানুয়ারি কর্ণাটক থেকে ছয় সন্দেহভাজন আই এস সহানুভূতিশীলকে গ্রেপ্তার করে আই এন এ। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রের অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াডের সঙ্গে যৌথ অভিযানে মুম্বইয়ের থানে সংলগ্ন আমরুত নগর থেকে মুনাবিত মুস্তাক শেখ ওরফে আমির নামে পরিচিত এক আই এস সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে আই এন এ। গণতন্ত্র দিবসকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে জঙ্গি হানা হতে পারে বলে সতর্কতা জারি ছিল আগেই। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির কর্মতৎপরতা সর্বত্র প্রশংসা পেয়েছে।

আমরুত থেকে মুনাবিত সিংকে গ্রেপ্তার করার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতে তাকে পেশ করে তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে এন আই এ তদন্তের জন্য দিল্লী নিয়ে যাবার আর্জি জানায়। এক তদন্তকারী আধিকারিক জানান, ধৃত ব্যক্তি হয় জঙ্গি সংগঠন আই এসের প্রতি সহানুভূতিশীল, নয়তো আই এসের সংযোগকারী (লিঙ্কম্যান)। মুনাবিতের বয়স তেত্রিশ বছর। কম্পিউটারে ডিপ্লোমা করেছে। থানেতে একটি ব্যক্তি-মালিকানাধীন সংস্থায় সে কাজ করতো।

*মুনাবিত মুস্তাক শেখ*

বর্তমানে সে বেকার বলে জেনেছেন গোয়েন্দারা। কিছুদিন আগেই মুনাবিত মুম্বইতে আসে এবং সোশ্যাল ওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে আই এসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এন আই এ-র নজরে এখন সোশ্যাল মিডিয়াগুলি। কারণ ভারতে সন্ত্রাসের জাল বিছাতে এই মিডিয়াগুলিকে সুকৌশলে ব্যবহার করছে আই এস। মুনাবিত-কে জিজ্ঞাসা করে বহু উল্লেখযোগ্য সূত্র মিলতে পারে বলে এন আই এ-র আশা।

অন্যদিকে কর্ণাটক পুলিশের সহযোগিতায় চারজনকে বেঙ্গালুরু, বাকি দু'জনকে ম্যাঙ্গালুরু ও তামাকুরু থেকে ছয় আই এস সহানুভূতিশীলকে গত ২২ জানুয়ারি গ্রেপ্তার করে আই এন এ। এর আগের দিনই এক আল কায়েদা সন্দেহভাজন মৌলনা আনজার শাহকে গ্রেপ্তার করার পর তাকে জেরা করে যে সূত্র উঠে আসে তার ভিত্তিতে এই আই এস সহানুভূতিশীলদের গ্রেপ্তার করে আই এন এ এবং কর্ণাটক পুলিশ। এক্ষেত্রেও সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নজরদারি চালিয়ে ওই ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ভাইরাসের মতো সন্ত্রাসকে জড়িয়ে দিতে যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার হচ্ছে, তাতে বিষয়টি নতুনভাবে ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই বয়স ২৫ থেকে ৩০ এর মধ্যে। সোস্যাল মিডিয়াকে বিপুল ব্যবহারের যে প্রবণতা এই বয়সী ছেলে-মেয়েদের রয়েছে, তাকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে চাইছে আই এস--- এমনটাই আশঙ্কা নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের।

## প্রবাসী বাঙালিদের প্রতিবাদ সভা

**সংবাদদাতা।।** কালিয়াচকে মুসলমান দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের প্রতিবাদে নয়াদিল্লির বরখাম্বা রোডের কাছে বঙ্গ ভবনে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন প্রবাসী বাঙালিরা। সভা থেকে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তাঁরা বলেন, বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতারণা করার কোনও অধিকার মুখ্যমন্ত্রীর নেই। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির কাছে পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ রুখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন বলে সংগঠন সূত্রে খবর।

# এন সি ই আর টি স্কুল পাঠক্রম থেকে নেতাজী ও স্বামীজীকে প্রায় ছেঁটে ফেলেছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন (সিআইসি) পাঠ্য পুস্তক থেকে দেশবরেণ্য বীর সুভাষচন্দ্র বসু ও মহান সমাজ সংস্কারক ও দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী কাট ছাঁট করার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করল এন সি ই আর টি (ন্যাশনাল কাউন্সিল অন এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং)-র প্রতিনিধিকে। সম্প্রতি রাইট টু ইনফরমেশন (আর টি আই) সংক্রান্ত এক মামলায় জয়পুরের এস পি রাজাওয়াত কী কারণে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যে বিবেকানন্দের জীবনী ১২৫০ থেকে মাত্র ৬৭ শব্দে নেমে এল এবং ২০০৭ সালে যেখানে নেতাজীর ওপর অষ্টম শ্রেণীতে ৫০০ শব্দের জীবনপঞ্জী ছিল তা হঠাৎ সম্পূর্ণ লোপাট হয়ে গেল কেন তা জানতে চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তাঁর আবেদনে এটাই জানানো হয় যে বিগতদিনে দ্বাদশ শ্রেণীতে নেতাজীর ওপর যে ১২৫০ শব্দ খরচ করা হয়েছিল তা বর্তমানে ৮৭ শব্দে এসে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, রাজাওয়াতের আরও বক্তব্য, ক্রিকেট ও কাপড়ের ইতিহাসের ওপর যেখানে ৩৭টি পাতা নির্ধারিত হয়েছে সেখানে শহীদ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বেশিরভাগই অবহেলার শিকার। অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে আর টি আই-এর মাধ্যমে প্রকাশ্যে এসেছে এন সি ই আর টি অনুমোদিত স্কুল পাঠ্য পুস্তকগুলিতে বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ, বটুকেশ্বর দত্ত, রামপ্রসাদ বিসমিলের মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্বদেরও সম্পূর্ণ অনুল্লেখিত রাখা হয়েছে।

এন সি ই আর টি-এর প্রতিনিধি অধ্যাপক নীরজ রাশমির হাতে সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন দেশের ৩৬ জন বিশিষ্ট বিপ্লবীর নামের একটি তালিকা অবিলম্বে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার আদেশের কপি তুলে দেন। অধ্যাপক রাশমি পাঠ্যক্রম পুনর্বিবেচনা কমিটির কাছে এই মর্মে দেওয়া নির্দেশ অতি শীঘ্র জমা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ভবিষ্যতে এই কমিটি যে আদেশ দেবে এন সি ই আর টি অবিলম্বে তা কার্যকর করার মুচলেকাও তিনি দিয়ে আসেন।

# আলিগড় ও জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যালঘু তকমা পরিয়ে রাখতে এককাট্টা বিরোধীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** কংগ্রেসের নেতৃত্বে একজোট হয়েছে আটটি বিরোধী দল। জনগণের করের টাকায় চলা আলিগড় ও জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু তকমা যাতে বরাবর বজায় থাকে, সেজন্যই তাদের এই জোট। কেন্দ্রের তরফে দেওয়া নানান রকম অর্থানুকূল্য কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায়ের মানুষই ভোগ করবে সংবিধানে এমন কোনো ধারা নেই। এই মর্মে কেন্দ্রের পূর্বতন সরকারগুলিও অভিমত জানিয়েছিল। সেই একই পথে বর্তমান সরকারও এই দু'টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যালঘু তকমা ঝেড়ে ফেলে অন্যান্য কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার তোড়জোড় শুরু করেছে। এতেই ক্ষুব্ধ কংগ্রেস-সহ আর জে ডি, জনতা (ইউ), এনসিপি, এপিপি, তৃণমূল ও বামদলগুলি। এই সব দলীয় নেতারা এই মর্মে একটি 'ধিক্কার প্রস্তাব' গ্রহণ করেছে এবং একইসঙ্গে এই প্রচেষ্টাকে জঘন্য বলা শুধু নয় সংখ্যালঘুদের চিন্তায় বুক চাপড়াচ্ছেন বলে খবর। ধিক্কার প্রস্তাবের কপি তাঁরা অচিরেই রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দিয়ে সরকারের এই প্রচেষ্টাকে আটকাবার চেষ্টা শুরু করছে বলে জানা যাচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপি-র তরফে বলা হয়েছে সংবিধান অনুযায়ী আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও জামিয়াকে কখনই সংখ্যালঘু আখ্যা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। তাই সরকার তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে দায়বদ্ধ।

এই সূত্রে বিরোধীগোষ্ঠী সরকারি অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যেরও নিন্দা করে বলেন, সরকারের তরফে 'গঙ্গা যমুনা তহজিবের' সংস্কৃতিকে নষ্ট করা হচ্ছে। সরকার সর্বোচ্চ আদালতের কাছে এই দু'টি সংস্থার সংখ্যালঘু তকমা মুছে দেওয়ার আবেদন করে তা নিশ্চিত করেছে। অন্যদিকে প্রত্যাশিতভাবে দেশের মুসলিম সংগঠনগুলি ও মৌলবিরা এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি বেশ কড়া মনোভাবই দেখাচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহল অনুসন্ধান করছে দেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো একটি বিশেষ শ্রেণীকে সংবিধানের তেয়াক্কা না করে অন্যান্য সুবিধে দেওয়া হয় কিনা?

# ২০১৮-র মধ্যে সবার কাছে থাকবে এল পি জি সিলিন্ডার

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** মোদী সরকার ২০১৬ সালের প্রথমেই দেশের সমস্ত ঘরেই

এল পি জি সিলিন্ডার পৌঁছনোর স্কিম শুরু করে ফেলেছে। সরকার ২০১৬ সালকে 'ইয়ার অব এল পি জি কনজুমারস্' ঘোষণা করেছে। আগামী ৩ বছরে দেশের বাকি ২০ কোটি পরিবারে এল পি জি সিলিন্ডার পৌঁছানো হবে। দেশে এখন ২৭ কোটি গ্রাহক রয়েছেন। এর মধ্যে ১৬.৫ কোটি সক্রিয় গ্রাহক এবং অয়েল মার্কেটিং কোম্পানিগুলি প্রায় ৬০ শতাংশ জনসংখ্যা কভার করছে।

# গৈরিকীকরণ বিষয়টা আদতে কী জানতে চাইলেন এন ই পি-র চেয়ারম্যান

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত (এন ই পি) কমিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও পূর্বতন ক্যাবিনেট সচিব টি এস আর সুব্রহ্মনিয়াম সম্প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, বাজারে চালু 'শিক্ষায় গৈরিকীকরণ' বস্তুটি সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই। শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলনের প্রবক্তা দীননাথ বত্রার সঙ্গেও তাঁর কোনো পরিচয় নেই। অত্যন্ত কৌতুকপ্রদভাবে সুব্রহ্মনিয়াম বলেন, 'গৈরিক কি কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ইউনিফর্মের রঙকে বোঝায়?' জাতীয় শিক্ষানীতির ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ কি বাজারে চালু 'গৈরিকীকরণের' দিকে যেতে পারে এমন একটি প্রশ্নের উত্তরেই চেয়ারম্যান এই ব্যঙ্গাত্মক জবাব দেন।

এই মর্মে শ্রী সুব্রহ্মনিয়াম সাংবাদিকদের জানান যে কমিটি সমস্ত রকমের মতামত সংগ্রহ করার কাজ শুরু করেছে। যেমন প্রাপ্ত একটি মত অনুযায়ী সরকারি বিদ্যালয়ের আর কোনো প্রয়োজন নেই। কেউ কেউ আবার যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন যে ভবিষ্যতে বিদ্যালয়গুলির আর কোনো শ্রেণীকক্ষের মধ্যে আবদ্ধ থাকার দরকার নেই। এই প্রসঙ্গে 'আমরা তো আবার ২০০০ বছর আগেকার গুরুকুল শিক্ষাক্রমেও ফিরে যেতে পারি না। বিগত ৭০ বছরে দেশ যে নানান পরিবর্তনের পথ পেরিয়ে এসেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতকে

টি এস আর সুব্রহ্মনিয়াম

মাথায় রেখেই আমাদের নীতি প্রণয়ন করতে হবে' বলেই তিনি মত প্রকাশ করেন।

একই সঙ্গে ছাত্র সম্প্রদায় যাতে নিঃস্বার্থপরতা, সততা ও পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা পায় তা দেখা জরুরি। এই সূত্রে তিনি আমেরিকার তুলনা টেনে বলেন, সেখানকার ছাত্রসমাজ যেমন তার দেশের জন্য গর্ববোধ করে ঠিক তেমনই আমাদের ছাত্ররাও যেন দেশের জন্য সদা সর্বদা গর্ববোধ করে। আমাদের লক্ষ্য ভারতীয়তায় অগ্রাধিকার।

পরিশেষে, শিক্ষানীতি নির্ধারক কমিটি বেশ কিছু শিক্ষাবিদের মতামত এড়িয়ে চলেছে এমন অভিযোগের উত্তরে সুব্রহ্মনিয়াম দ্বর্থহীন ভাষায় জানান, মানব সম্পর্ক উন্নয়নমন্ত্রক সব প্রটোকল ভেঙে সমাজের বিস্তৃত ক্ষেত্রের বিদগ্ধজনদের মতামত নিচ্ছে।' এতদিনের মৌরুসিপাট্টা ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কাতেই তাঁদের এমন অভিযোগ বলে মনে হয়।

# বামপন্থী বুদ্ধিজীবী অরুন্ধতী রায় আদালত অবমাননা ঠেকাতে ব্যস্ত

*অরুন্ধতী রায়*

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** সৌখিন মাওবাদী সমর্থক ও লেখিকা অরুন্ধতী রায় সম্প্রতি মাওবাদী ঘনিষ্ঠ প্রবীণ অধ্যাপক গোকারারকোণ্ডা নাগা সাইবাবাকে সুপ্রিম কোর্ট যে হাজির হওয়ার সমন পাঠায় তার নিন্দা করে বক্তব্য পেশ করেছেন। আদালত তাঁর এই মন্তব্যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। বিচারকরা তাঁর দাখিল করা নাগা সাইবাবার আদালতে হাজির হওয়ার নিন্দাসূচক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলাটি খারিজ করার আবেদন গ্রহণ করলেও ব্যক্তিগত হাজিরা (অরুন্ধতীর) থেকে অব্যাহতি দিলেন না। ২০১৪ সালে শ্রীমতী রায় তাঁর লেখা এক প্রবন্ধে আদালতে সাইবাবার আবেদন নাকচ হওয়াকে গুজরাট দাঙ্গায় বহু অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর হওয়ার সঙ্গে ব্যঙ্গাত্মক তুলনা করেছিলেন। এর পরই গত সালের ২৩ ডিসেম্বর সর্বোচ্চ আদালত তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করে। আগামী ২৫ জানুয়ারি অরুন্ধতী কোনো ছলেই আর ব্যক্তিগত হাজিরা এড়াতে পারবেন না। আদালতে যেতে গেলেই আর একদল মহামান্যদের অনীহা আমরা কিছুদিন আগেই প্রত্যক্ষ করেছি।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
**প্রণব**
পড়ুন ও পড়ান

# মালদহ সীমান্তে কড়া হাতে গো-পাচার রুখল বি এস এফ

**সংবাদদাতা ॥** মালদহ জেলার বামনগোলা ব্লকের খুটাদহ বাংলাদেশ সীমান্তে গত ২৩ জানুয়ারি বিএসএফের ৩১নং ব্যাটালিয়ান এক বড় অভিযান চালিয়ে সীমান্তে গোপাচার রুখে দিয়েছে। মালদহ- বাংলাদেশ সীমান্তে প্রতিরাত্রে গৃহস্থের গবাদিপশু চুরি করে সীমান্তের ওপারে পাচার করে দেওয়া নিত্যদিনের ঘটনা। এ নিয়ে গ্রামবাসীদের অভিযোগ মূলত বি এস এফের ওপর। বি এফ এস সূত্রে খবর, গুলি করার অনুমতি না থাকায় বি এস এফ জওয়ানরা প্রায়ই পাচারকারীদের হাতে মার খায় এবং মারাও যায়।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-য়ের নির্দেশ যে কোনো মূল্যে গোরু পাচার বন্ধ করতে হবে, নির্দেশ আসায় তারা সক্রিয় হয়েছে। সূত্রে খবর, সেদিন রাত ১২টায় একটি গোরুপচারের দল বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে খুটাদহ এলাকায় প্রবেশ করে। ৩১ নং ব্যাটালিয়ানের জওয়ানরা গুলি করলে পাচারকারীরা দু'টি গোরু, একটি মোবাইল ফোন, সিমকার্ড ও তারকাটা মেসিন ফেলে পালিয়ে যায়। এই প্রথম বি এস এফের কড়া ভূমিকায় গ্রামবাসীরা সন্তুষ্ট।

## উবাচ

"বাংলায় কোনো শিল্প নেই। রয়েছে শুধু চিট ফান্ড শিল্প। ...রাজ্যে যেখানেই বিস্ফোরণ হয়, সেখানেই তৃণমূল। এটা কাকতালীয় হতে পারে না।"

**অমিত শাহ**
বিজেপি সভাপতি,
*হাওড়ার ডুমুরজলা ময়দানে জনসমাবেশে।*

"আমরা জানি কারা আমাদের উপর হামলা করছে। তারা নানাভাবে আমাদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এটা আমাদের দৃঢ়তাকেই শুধু বাড়াবে।"

**ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ**
ফরাসি প্রেসিডেন্ট
*ভারত সফরে এসে যৌথ বিবৃতিতে।*

"১৯৯০ সালে করসেবকদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়ায় আমি দুঃখিত।"

**মুলায়ম সিং যাদব**
সমাজবাদী পার্টি প্রধান।
*বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুরের জন্মদিনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে।*

"১৯৫০ সালে বরিশাল ও মেঘনা সেতুর উপর রক্তস্নাত দিনগুলি! সেদিন কী ঘটেছিল আজকের যুবক-যুবতীরা তাদের দাদু-দিদাকে জিজ্ঞাসা করুক। কালিয়াচক সম্ভবত তারই শেষ সতর্কবার্তা।"

**তথাগত রায়**
ত্রিপুরার রাজ্যপাল
*১১ জানুয়ারি ট্যুইটারে মন্তব্য।*

# মদন-মুকুল-আরাবুল ফিরে এল বিলকুল

মাননীয় দিদি,

আপনি যতই মুখ্যমন্ত্রী হোন না কেন, আপনাকে আমি বরাবরই দিদি ডাকতে পছন্দ করি। আর আজ তো এই শীতের সকালে আপনার জন্য গান গাইতে ইচ্ছে করছে। সেই উষা উত্থুপের গানটা— ও দিদি, দিদি, দিদি, দিদি গোও-ও-ও...

শিয়রে ভোট। ভাঙড় আসন পুনরুদ্ধার মর্যাদার প্রশ্ন। তাই আগেভাগেই সমর্যদায় দলে ফিরিয়ে নিলেন আরাবুল ইসলামকে। তৃণমূল কর্মী খুনে নাম জড়ানোয় তাঁকে ৬ বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছিল। ১৪ মাস হয়ে গেছে। অনেক শাস্তি পেয়েছে কাজের ছেলেটা। সুতরাং ক্ষমা প্রদর্শন, ভাঙড়ের দাপুটে ছেলেটাকে!

সেই সঙ্গেই ব্লক সভাপতির পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এলাকার রাজনীতিতে আরাবুলের বিরোধী শিবিরের নেতা বলে পরিচিত কাইজার আহমেদকে। ভোটের আগে এমন সিদ্ধান্তকে হাতিয়ার করে বিরোধীরা স্বভাবতই দাবি করেছে, আরাবুলকে শাস্তির ঘোষণা নেহাতই লোকদেখানো ছিল। বিগত লোকসভা ভোটে যাদবপুর কেন্দ্র থেকে সুগত বসুর জয়ের পিছনে আরাবুলের বাহিনীর অবদান ছিল। সে বলুক। কিন্তু যারটা সে বোঝে। বিধানসভা ভোটেও তার মতো 'সংগঠকে'র প্রয়োজন অপরিহার্য বুঝেই দিদি আরাবুলকে কাছে টেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেশ করেছেন।

এবার দলে আরাবুলও থাকবে, রেজ্জাকও থাকবে। ভাঙড় ও ক্যানিং এলাকায় দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা চাই। সেই জন্য সম্প্রতি আব্দুর রেজ্জাক মোল্লাকে কাছে টানার চেষ্টা করছেন আপনি।

কালীপুজোর সময় আপনার বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন আরাবুল। আপনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন। ক্ষমা চেয়ে দলকে চিঠিও দিয়েছিলেন। সুতরাং ঠিক করেছেন দিদি। ক্ষমা পরম ধর্ম। এবং এটা সেকুলার ধর্ম।

এ নিয়ে দারুণ বলেছেন শোভনদা। মানে কলকাতার মেয়র। আপনার আদরের কানন। বলেছেন, 'মা ছেলেকে শাসন করে। কিন্তু কোল থেকে সরিয়ে ফেলে দেন না।'

ফিরেছেন মুকুল রায়ও। দিল্লিতে প্রথমে বাটার টোস্ট, তারপর চাইনিজ। কলকাতায় প্রথম গজলের আসর, তারপর একই ট্রেনে করে উত্তরবঙ্গ সফর এবং মঞ্চ-ভাগ। ধাপে ধাপে মুকুল আবার ঘরের ছেলে। দেখে মনে হচ্ছে যেন, সারদা'র গন্ধ অনেকটাই উবে গেছে মুকুলের গা থেকে। তবে পুরোটা এখনও যায়নি। কারণ, আপনি দেখলাম পাশে পাশে বিশেষ থাকছেন না।

শিয়ালদহ স্টেশনে পদাতিক এক্সপ্রেসে ওঠার সময় মমতার খানিক পিছনে ছিলেন মুকুল। এন জে পি স্টেশনেও প্রায় একই ছবি। অবশ্য স্টেশনে যাওয়ার আগে নিজের গাড়িতেই মুকুলকে ডেকে নেন আপনি। সাফারি পার্কের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনেকদিন পর আপনার সঙ্গে একমঞ্চে উঠলেন। কেমন যেন জড়সড় লাগছিল।

কিন্তু দিদি, ভাইপো আগে না মুকুল আগে? এটা আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে। অবশ্য আপনি যা ট্যালেন্টেড, দু'জনকে এক ঘাটে জল খাওয়াতে পারেন। কেউ না জানুক, আমি জানি।

এবার মদন। এখনও জেলে। ছাড়া পাওয়ার আশা কম। কিন্তু কাজের ছেলে। মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়েও যখন জেল আটকানো যায়নি, তখন প্রভাবশালীর প্রভাব খাটানো যাক। দারুণ থিওরি দিদি!

বিধানসভা ভোটে জেলবন্দি মদন মিত্রকে প্রার্থী করা হবে কি? চলছিল জল্পনা। কিন্তু দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় দলের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার আগেই মদনকেই এবার প্রার্থী করা হবে বলে শনিবার কামারহাটিতে তৃণমূলের কর্মী সম্মেলনে ঘোষণা করে দিয়েছেন। অনেকে বলছে, এটা ভুল করে নিজে নিজে করেছেন সৌগতবাবু। কিন্তু আমি জানি, সৌগতবাবুর অত সাহস হবে না। আসলে আপনি সৌগত রায়কে দিয়ে প্রস্তাবটা পেড়ে জল মেপে নিলেন। এবার কামারহাটির কর্মীদের উৎসাহ বেড়ে যাবে। আর আপনি বলতে পারবেন, কর্মীদের উৎসাহের চাপেই মদনকে প্রার্থী করতে হচ্ছে। সাপ মরবে। লাঠিও ভাঙবে না। দিদি তোমারে সেলাম!

চিঠি আর লম্বা করব না। আপনি এখন সরকারি খরচে সরকারি অনুষ্ঠান প্রাক নির্বাচনী প্রচার সারছেন জেলায় জেলায়। এই সময়ে আপনাকে বেশি বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

চালিয়ে যান দিদি।

একেই বলে রাজনীতি।

— **সুন্দর মৌলিক**

# বাম-কংগ্রেস সমঝোতা এক নীতিহীন আঁতাত

**বিনয়ভূষণ দাশ**

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। রাজ্যের দু'টি ক্ষয়িষ্ণু রাজনৈতিক দল তাদের দীর্ঘ রাজনৈতিক বৈরিতা পরিহার করে, নীতি ও আদর্শ বিসর্জন দিয়ে একে অপরের হাত ধরার ইঙ্গিত দিয়েছে। বঙ্গ রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নীতিহীন ভোট সর্বস্ব রাজনীতির সূচনা হয়েছে গত ডিসেম্বরের শেষে সিপিএমের কলকাতা প্লেনাম থেকে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে ১৯৬৪ সালে জন্মলগ্ন থেকেই সিপিএম নামক দলটি স্রেফ কংগ্রেস বিরোধিতা করেই পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং কেরল— এই সোয়া তিনটি রাজ্যে তাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। বাংলা কংগ্রেসের প্রয়াত অজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং পরবর্তীকালে সংগঠন কংগ্রেসের প্রয়াত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিসর দখল করে, বাঙালি ভাবাবেগকে সম্বল করে ক্ষমতায় এসেছিল। ক্ষমতায় আসার পরেও বাঙালির কংগ্রেস এবং কেন্দ্র বিরোধিতার মানসিকতাকে ইন্ধন দিয়ে সাত সাতটি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন থাকে। যদিও, মাঝে ১৯৬৯ সালে সরাসরি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসকে সমর্থন করে কংগ্রেসকে কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করে। তাছাড়া ২০০৪ সালে সোনিয়া মাইনো গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-১ এর সংখ্যালঘু সরকারকে সমর্থন করে স্পিকার পদে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বসিয়ে এবং ইউপিএ-১ এর 'সমন্বয় সমিতি'তে (Co-ordination Committee) সক্রিয় অংশগ্রহণ করে কংগ্রেসকে সরকার গড়তে এবং টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। মূলত কংগ্রেস বিরোধিতাকে কেন্দ্র করেই সিপিএমের বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল। কিন্তু সবকিছু ওলট্‌পালট করে দিল প্রকাশ কারাটের নেতৃত্বাধীন সিপিএম। ইউপিএ-১ থেকে বামেদের সমর্থন প্রত্যাহার। অতঃপর বিগত বিধানসভা নির্বাচনে একদা কংগ্রেসেরই দলছুট তৃণমূল কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের আসন সমঝোতা করে নির্বাচনে লড়াই। ওই জোট সাধারণ মানুষের তীব্র সিপিএম বিরোধিতার ঢেউয়ে চড়ে বিপুলভাবে জিতে ক্ষমতাসীন হয়। দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসরের সিপিএম নেতৃত্বাধীন জগদ্দল বাম সরকারের পতন ঘটে যা বার্লিনের প্রাচীর ধ্বংস হওয়ার মতো ঘটনা। স্মর্তব্য যে এর মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া এবং বেশিরভাগ পূর্বইউরোপের দেশগুলি থেকে কমিউনিস্ট শাসকদের পতন ঘটেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিমালয়সদৃশ এই পতন ক্ষমতালোভী সিপিএম মেনে নিতে পারেনি। তাদের এতাবৎকালের 'কাল্পনিক' নীতিনিষ্ঠার আবরণ মুহূর্তে খসে পড়ে; তাঁদের অবস্থা হয় 'জলছাড়া মাছে'র মতন। যে শুঁয়োরের খোঁয়াড়ে তাঁরা ঢুকেছিলেন নির্বাচনে জিতে তারই অবৈধ প্রেমে পড়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে তাঁরা। এ অবস্থা থেকে বেরোতে তাঁরা খুঁজতে থাকে কোনো পথ।

> "অধীর চৌধুরীরা পুরনো বন্ধু বামেদের হাত ধরলেও বামেরা আর তাদের প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাবেন না। বাংলার মানুষ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে তাদের নিক্ষেপ করবেনই।"

সীতারাম ইয়েচুরি সাধারণ সম্পাদক

হবার পরে তাঁদের এ অন্বেষণ আরও বাড়ে। তাঁদের হিসেব মতো, গত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল ৩৪টি লোকসভা আসন জিতলেও ভোট পেয়েছিল ৩৯ শতাংশ আর বামেরা পেয়েছিল ৩০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট; অন্যদিকে কংগ্রেস পেয়েছিল ১০ শতাংশ ভোট। অন্য শিবিরের বিজেপি পেয়েছিল ১৭ শতাংশ ভোট। এমতাবস্থায় সীতারাম ইয়েচুরি, প্রকাশ কারাট, সূর্যকান্ত মিশ্র, মহঃ সেলিম, বিমান বসুরা ভাবছেন, দুই দুইয়ে চার হয়ে যাবে যা তৃণমূলের ৩৯ শতাংশের বেশি এবং এই জোট রমরমিয়ে তৃণমূলকে হারিয়ে আবার ক্ষমতায় এসে যাবে বিধানসভা নির্বাচনে। কিন্তু দুই দুইয়ে সব সময় চার হয় না, একও হয়ে যেতে পারে তা ভুলে যাচ্ছে এই সিপিএম নেতৃবৃন্দ। দু'টি ক্ষয়িষ্ণু, জনগণের পরিত্যক্ত দল এক হলে যে সাধারণ মানুষ তাদের আরও আস্তাকুড়ে ফেলে দেবে এ সত্যটি এরা জানেন, কিন্তু মানতে চান না। দু'টি পরস্পর বিরোধী নীতি ও আদর্শের দল শুধুমাত্র ক্ষমতায় আসার জন্য জোটবদ্ধ হলে জনসাধারণের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা যে তলানিতে পৌঁছে যায় সে ধারণাটুকুও তাদের নাই। তাই পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম যে কোনো খড়কুটো অবলম্বন করে রাজ্যে তাদের প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখতে চাইছে। একদিকে তাই অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করা নেতাকে রাজ্য সম্পাদক ও বিরোধী নেতার পদে বসিয়েছে।

অন্যদিকে, বিশাখাপত্তনমে ২১তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কংগ্রেস ও বিজেপি থেকে সমদূরত্বের নীতিও ত্যাগ করতে হচ্ছে। আবার, প্রস্তাবিত জোটের বাধ্যবাধকতার কারণে প্রকাশ কারাট এবং সীতারাম ইয়েচুরিকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষে এবং কেরলে কংগ্রেসের বিপক্ষে প্রচার করতে হবে। এটা করবেন তো কারাট-ইয়েচুরি জুটি? পারবেন কি তাঁরা বিজেপিকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উঠে আসা থেকে ঠেকাতে?

অন্যদিকে, ক্রমক্ষয়িষ্ণু জাতীয় কংগ্রেসের ভোটভাগ ক্ষয় হতে দক্ষিণবঙ্গে ১.৫০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহেও আগের মতো অবস্থায় নেই কংগ্রেস। মালদহে গনিখান চৌধুরী পরিবার এবং মুর্শিদাবাদের সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর পায়ের তলার মাটিতে ধ্বস নেমেছে। সে ধ্বস থামানোর ক্ষমতা কারও আছে বলে মনে হয় না। অধীর চৌধুরী ও তাঁর সতীর্থ প্রদীপ ভট্টাচার্য, সোমেন মিত্র, আব্দুল মান্নান, ওমপ্রকাশ মিশ্ররা সোনিয়া গান্ধীর কাছে দরবার করেও খুব সুবিধা করতে পারবেন বলে মনে হয় না। পশ্চিমবাংলার মানুষ একবার কোনো দলকে বর্জন করলে তাদের আর ফিরিয়ে আনেন না। যেমন আনেননি কংগ্রেসকে। সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টকে বাংলার মানুষ ত্যাগ করেছেন।

তাই তাদেরও আর ফিরিয়ে আনবেন না। অধীর চৌধুরীরা পুরনো বন্ধু বামেদের হাত ধরলেও বামেরা আর তাদের প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাবেন না। বাংলার মানুষ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে তাদের নিক্ষেপ করবেনই। দলছুট, ছিন্নমূল তৃণমূলের বিভেদকামী, উগ্রসংখ্যালঘু- জনিত সাম্প্রদায়িক, উন্নয়ন-বিরোধী রাজনীতিকেও পশ্চিমবাংলার মানুষ ত্যাগ করবেন।

প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে সূর্যকান্ত মিশ্ররা যতই কাতর আহ্বান জানান কংগ্রেসের কাছে জোট গড়ার আর্জি জানিয়ে, অধীর চৌধুরীরা যতই হাত বাড়িয়ে দিন তাঁদের পুরনো বন্ধু বামেদের দিকে; পশ্চিমবাংলার মানুষ তাতে ভুলবেন না। মানুষ জানে, কংগ্রেসের ১০ শতাংশ ভোটের প্রায় সবটাই গেছে তাদের দলছুট তৃণমূলের দিকে। আর সিপিএমের গত নির্বাচনের প্রাপ্ত ভোটের বেশিরভাগই চলে যাবে গেরুয়া শিবিরে। শেষ অবধি যদি সত্যিই বাম-কংগ্রেস সমঝোতা হয় সোনিয়া-রাহুলের সায়ে, যেটা আমার ব্যক্তিগতভাবে বাস্তবায়িত হবে না বলেই ধারণা, তাহলে ওই অশুভ আঁতাতের হাতে শেষ অবধি 'পেনসিল্'ই থাকবে।

*(লেখক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক)*


জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক

**স্বস্তিকা**

পড়ুন ও পড়ান

**প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা**

**বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা**


## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মাণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

# পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়-তর্পণে ভাউরাও দেওরস

**সংকলক : রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক**

''আমি ভাউরাও দেওরস সর্বপ্রথম লক্ষ্ণৌ শহরে পা রাখি ১ জুলাই ১৯৩৭ সালে। পরবর্তীকালে আমার জীবনের ৫৩ বছর বয়সের অধিকাধিক কালখণ্ড যে ব্যক্তির সান্নিধ্যে কাটে তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। মহান কোনো কাজের জন্য ভগবান কীভাবে যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে জুটিয়ে দেন তা আমার বলার অসাধ্য।'' উত্তরপ্রদেশে আমাদের দু'জনের প্রবেশ প্রায় একই সময়ে। ভাউরাওজী এলেন নাগপুর থেকে আর দীনদয়ালজী এলেন রাজস্থান থেকে। ভাউরাওজী বিদ্যার্থী হিসাবে লক্ষ্ণৌতে আর দীনদয়ালজী কানপুরে কলেজে ভর্তি হলেন। পড়াশুনার নিমিত্তে।

''সঙ্ঘকাজের উদ্দেশ্যে আমি কানপুর যাওয়া আসা শুরু করলাম— আর প্রথম প্রয়াসেই দীনদয়ালজীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়ে গেল। বলা যেতে পারে দীনদয়ালজী কানপুর শহরের প্রথম স্বয়ংসেবক। কানপুরের শাখা সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান পণ্ডিত সাতলেকরজীর উপস্থিতিতে শুরু হয়। সঙ্ঘের যে প্রতিজ্ঞা পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে তাতে দীনদয়ালজী প্রথম প্রতিক্ষিত স্বয়ংসেবক কানপুরের।''

ভাউরাওজীর প্রথম থেকেই কেমন যেন মনে হোত দীনদয়ালজী নিশ্চয়ই কোনো বড় কাজ করার জন্য জন্মেছেন। ''কখনও কখনও আমি দীনদয়ালজীর তুলনা সঙ্ঘ সংস্থাপক ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের সঙ্গে করি। ডাক্তারজীর মাতা-পিতা বাল্যকালেই (একই দিনে) মারা যান আর দীনদয়ালজীর মাতা পিতাও বাল্যকালে দেহত্যাগ করেন। সমাজ যাকে অনাথ বালক বলে— দীনদয়ালজীর অবস্থাও অনাথতুল্য। কিন্তু অনাথ বালক হওয়া সত্ত্বেও নিজের যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সে যুগে যত অধিকাধিক পড়াশুনা করা সম্ভব তা তিনি করেছেন। শুধু পড়াশুনা

নয় একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থী হিসাবে তিনি তাঁর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সব পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হতেন। নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা পড়াশুনা সব কিছুই সরকারি স্কলারশিপের সাহায্যেই করেছেন। কানপুর থেকে পড়াশুনার জন্য দীনদয়ালজী আগ্রায় যান। আমারও পড়াশুনা শেষ হয়ে যাওয়ায় আমিও দীনদয়ালজীর পিছু পিছু আগ্রায় রওনা হলাম। আগ্রার বিদ্যার্থী জীবন শেষ করে যখন দীনদয়ালজী প্রয়াগে ফিরে আসনে, আমিও তখন প্রয়াগে যাতায়াত শুরু করি। তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের জন্য। ১৯৩৭ সালে পরস্পরের যে সম্পর্ক শুরু হয় তা সতত চলতেই থাকে।

আমার সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে সঙ্ঘের কাজের জন্য দীনদয়ালজী প্রচারক বেরোন এমন কোনো ইচ্ছা আমি কখনও তাঁকে বলেছি এরূপ মনে পড়ছে না। বিদ্যার্থী জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পর একদিন দীনদয়ালজী নিজের থেকেই আমার কাছে এলেন এবং বললেন— ''সঙ্ঘের কাজের জন্য সময় দিতে আমি প্রস্তুত। যেখানেই পাঠাবেন সেখানে যেতে আমি তৈরি।'' এই ভাবে উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রথম প্রচারক হিসাবে শ্রেয় যদি কাউকে দিতে হয়— তিনি দীনদয়ালজী। বিদ্যার্থী জীবন শেষ করার পর কোনো না কোনো সামাজিক কাজে নিজের জীবনকে লাগানোর ইচ্ছা মনের মধ্যে ছিলই। সেই ভাবনার তাগিদে সঙ্ঘের কাজের মাধ্যমে সমাজ সেবার ইচ্ছা হিসাবে তিনি প্রচারক হিসাবে বের হোন। এতে আমার ভূমিকা তো নিমিত্তমাত্র।

পরবর্তীতে আজকে দেশের তাবড় তাবড় নেতা যেমন অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো আরও অনেক ব্যক্তিত্ব সঙ্ঘের কাজে যুক্ত হয়ে যায়। বাজপেয়ীজীও অধ্যয়ন শেষ হওয়ার পর একদিন আমার সমক্ষে এসে বলেন ''আমার জন্য কোনো কাজের যোজনা থাকলে তা করবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।'' আমি বাজপেয়ীজীকে বাল্যাবস্থা থেকেই জানতাম, উনি গোয়ালিওরের মূল নিবাসী। সম্ভবত নবম শ্রেণীতে পড়াশুনা করতেন তবুও ওই বয়সেই তাঁর কবিত্ব সবাইকে মুগ্ধ করে দিত। কানপুর ও গোয়ালিওরে পড়াশুনা শেষ করে যখন বাজপেয়ীজী লক্ষ্ণৌতে এলেন তখন দীনদয়ালজী ও আমরা সব বসে চিন্তা করে বাজপেয়ীজীকে অধিকাধিক কোনো কাজে লাগানো যায় তার চিন্তা করতে লাগলাম, অটলবিহারী বাজপেয়ীজীর প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে এবং সঙ্ঘের কিছু সাহিত্য নির্মাণের কথা ভেবে পরবর্তীতে রাষ্ট্রধর্ম প্রকাশ নির্মাণের কথা ভাবা হয়েছিল।

আমরা রাষ্ট্রধর্ম প্রকাশন কোনো ব্যবসা ইত্যাদির কথা মাথায় রেখে শুরু করিনি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দ্বারা যত ধরনের কাজই চলছে তার কোনোটাই ব্যবসায় নিমিত্তে নয়। সমাজচেতনার অঙ্গ হিসাবে জনজাগৃতির দৃষ্টিতে যে যে কাজ আমরা দেশব্যাপী দাঁড় করিয়েছি— রাষ্ট্রধর্ম প্রকাশন সেই ধরনেরই একপ্রকার পরম্পরা। অটলবিহারী বাজপেয়ী, দীনদয়ালজী, নানাজী দেশমুখ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই সব কাজ দাঁড় করিয়েছেন। এই রাষ্ট্রধর্ম প্রকাশনরূপী কাজের উপর মাঝে মধ্যেই এতধরনের

আপত্তি-বিপত্তি এসেছে যে অনেকবার মনেও হয়েছে এই ধরনের কাজ বন্ধ করে দিলেই ভালো, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রতিবন্ধকতার বিষয় ছিল গান্ধী হত্যার অভিযোগ। সে সময় আমাদের সব কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এমনকী প্রেসেও তালা ঝুলে গিয়েছিল। ওই সময় সব কাজ চালানোর নানান ধরনের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করা এক কঠিন কাজ ছিল। গান্ধী হত্যার অভিযোগ থাকার কারণ কোনো পরিবারেই আমাদের স্থান হোত না। সেই সময় তো আমি জেলে ছিলাম। দীনদয়ালজী জেলের বাইরে থেকে সব ধরনের কাজ সামলাতেন।

**রাজনীতি কেন?**

কিন্তু রাষ্ট্রধর্ম প্রকাশন যে ধরনের কাজ তা আবার শুরু হলো কীভাবে? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সঙ্ঘকে আরও কী কী ধরনের কাজ শুরু করা উচিত তার চিন্তন হতে থাকল। ওইসব চিন্তা ভাবনায় উঠে এল যে রাজনীতি রাষ্ট্রজীবনের পরিপূর্ণ বিষয় না হলেও একটি মহত্ত্বপূর্ণ অঙ্গ তো বটেই। রাজনীতিকে একেবারে উপেক্ষা করা যাবে না। এই ধরনের চিন্তা ভাবনা সঙ্ঘের মধ্যে শুরু হওয়ায় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মতো ব্যক্তিত্ব এগিয়ে এলেন, শ্যামাপ্রসাদবাবু পরমপূজ্য শ্রীগুরুজীর সঙ্গে দেখা করে বললেন, কিছু কার্যকর্তার সহযোগ ছাড়া একার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব হবে না। তখন ড. মুখার্জীর সহযোগী কার্যকর্তা হিসাবে সারাদেশে কিছু উৎকৃষ্ট কার্যকর্তাদের চয়ন শুরু হলো যাঁরা রাজনীতিতে থেকেও রাজনীতিতে লিপ্ত হবেন না;— রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে না পদ প্রতিষ্ঠা, যশ মোহতে আবিষ্ট হবেন না, ওই ধরনের ব্যক্তির মধ্যে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম।

তাঁকে ভারতীয় জনসঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হলো, নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি 'নেতা নন' এরূপ মনোভাব নিয়ে কাজ করেন। সঙ্ঘশিবিরে গেলেও সর্বসাধারণ স্বয়ংসেবকদের মতোই ব্যবহার করতেন। কোনো অন্য ভাব তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হোত না। তাঁর এই সরল সাধারণ জীবন রচনাই তাঁকে শ্রেয়ের অধিকারী করেছিল। বর্তমানে রাজনীতিতে যে সমস্ত নেতারা কাজ করছেন তাঁদের কাছে আমার বিনম্র নিবেদন তাঁরা দীনদয়ালজীর জীবন থেকে শিক্ষা নিন।

তিনি যা বলতেন সেই অনুরূপ আচরণেও করে দেখাতেন। এই ধরনের ব্যক্তিকে আমি সত্য সত্যই সন্ত পুরুষ মনে করি। সন্তপুরুষের মতো দীনদয়ালজী হয়তো বেশভূষা পরিধান করতেন না কিন্তু সমাজের সামনে যা বলতেন নিজের আচরণে তা করে দেখাতেন। আমি যখন তাঁর বিষয়ে চিন্তা করি তখন আমাদের দেশে যে সন্তপরম্পরা আছে তা ছাড়াও এক শ্রেণীর সন্ত আছেন যাঁরা সরাসরি রাজনীতি না করলেও রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন, সারা মহারাষ্ট্রে এই পরম্পরা অত্যন্ত প্রবল ছিল। মহারাষ্ট্রে স্থানে স্থানে ছোট ছোট হনুমানজীর মন্দির তৈরি করে আখড়া নির্মাণ করা হোত। ওই সব আখড়াতে লোকেরা ব্যায়াম করতো আবার সংগঠিতও হোত, অর্থাৎ রামদাস স্বামী সম্পূর্ণ মহারাষ্ট্রে জনজাগৃতির কাজ করেছেন। কিন্তু প্রয়োজন পড়লে শিবাজীকে বা তাঁর পুত্র শম্ভাজীকে উপদেশ দেওয়ার কাজও করতেন। এইজন্য সন্ত মানে শুধু নিজের মুক্তির জন্য হিমালয়ের পথে পা বাড়ানো, সমাজের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করা এই ধরনের ধারণার পরিবর্তনের আবশ্যকতা আছে।

**বিবেকানন্দের পরম্পরাতে**

আমাদের দেশে আধুনিক কালেও স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দ সাধু-সন্তের সেই পরম্পরাতে হওয়া সত্ত্বেও জনজাগৃতির কাজ তাঁরা করেছেন। ওই পরম্পরার অন্তর্গত লোকমান্য তিলক ও সঙ্ঘ সংস্থাপক ডাঃ হেডগেওয়ারও ছিলেন। পণ্ডিত দীনদয়ালজী উপাধ্যায়ও সেই পরম্পরার অন্তর্গত।

দীনদয়ালজীকে শুধুমাত্র একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে দেখলে মহাভুল হবে। তিনি রাজনীতিতে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে জনজাগৃতিরও কাজ করেছেন। কিন্তু নিজে কোনোদিন কোনো পদের জন্য লালায়িত হননি। কাজ করতে করতে যখন যা দায়িত্ব পেয়েছেন তা সহাস্যে স্বীকার করেছেন এবং সকলের আগ্রহের কারণে ১৯৬৭ সালে কালিকটের অধিবেশনে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় অধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করেছেন।

১৯৬৭ সালে কেরলে কমিউনিস্টদের সরকার ছিল। তাই সকলে চিন্তিত ছিলেন কালিকটে অধিবেশন কীভাবে সম্পন্ন হবে? মারপিট ইত্যাদির আশঙ্কা আছে কিনা? কিন্তু সারাদেশ থেকে যেভাবে কার্যকর্তারা অধিবেশনে যোগদান করেন তাতে করে অধিবেশন অত্যন্ত সফল ও যশস্বী হতে পেরেছে। অধিবেশন শেষে পণ্ডিতজী বেশ প্রসন্নতার সঙ্গে এদিক-ওদিককার কিছু কার্যকর্তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে আবার লক্ষ্ণৌ এর পথে রওনা হয়ে যান। আমিও ওই সময় লক্ষ্ণৌতে ছিলাম। ওই সময় উত্তরপ্রদেশে সংযুক্ত বিধায়ক দলের ঢিলেঢালা এক সরকার কোনোরকম চলছিল। ওই সরকারে জনসঙ্ঘের কিছু কার্যকর্তা মন্ত্রীহিসাবে কাজ করছিলেন। যখন আমাদের কিছু মন্ত্রী কেরলের অধিবেশনে রওনা হয়ে যান তখন মুখ্যমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং কারোর সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করে কিছু মন্ত্রীদের অদল-বদল করে দেন। পণ্ডিত দীনদয়ালজীর আগ্রহে জনসঙ্ঘের যে সমস্ত মন্ত্রীরা কাজ করছিলেন সবাই মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত বলে মনে করলেন। ওই সব মন্ত্রীর ক্ষমতার কোনো লালসা থাকা উচিত নয়। কিন্তু তিনি অন্তিম কোনো নির্ণয় দিলেন না। কার্যকর্তাদের এক বৈঠকে যাওয়ার জন্য পরদিন পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

**সেই কালরাত্রি**

ওই সময় উত্তরপ্রদেশ প্রান্তে পরমপূজনীয় শ্রীগুরুজীর প্রবাস ছিল। আমিও দীনদয়ালজীর পিছু পিছু অন্য ট্রেনে রওনা হয়ে গেলাম। কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ সালের সেই কালরাত্রি তাঁর জীবনের শেষ রাত্রি। হত্যার দিন রাতে জৌনপুর স্টেশন পর্যন্ত তিনি নিশ্চিত জীবিত ছিলেন। কারণ ওই সময় জনসঙ্ঘের রাজাসাহেব নামে এক কার্যকর্তা একটি পত্র ওই রাতে দীনদয়ালজীর হাতে দিয়ে আসেন। দীনদয়ালজীকে রাতে জাগিয়ে ওই পত্র তিনি

দীনদয়ালজীকে দিয়েছেন এই সংবাদ তো আমার জানা ছিল এই জন্য পণ্ডিতজীর হত্যা জৌনপুর এবং মোগলসরাই স্টেশনের মাঝামাঝি কোনো জায়গা হয়ে থাকবে। কিন্তু হত্যা কে করল? রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র না অন্য কিছু তার কোনো কিনারা পাওয়া গেল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ধরনের হত্যা হতেই পারে কারণ সারাবিশ্বে এরকম অনেক উদাহরণ আছে। আমারও মনে হয়েছে দীনদয়ালজীর হত্যা এই ধরনের কোনো ষড়যন্ত্রের ফল। তিনি এতই মিষ্ট স্বভাবের ছিলেন যে তাঁকে অজাতশত্রু বলা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারুর সঙ্গে তাঁর কোনো শত্রুতা বা ঝগড়া হতেই পারে না। এই ধরনের হত্যা তো শুধুমাত্র কোনো রাজনৈতিক কারণেই হতে পারে। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ রাতে যখন এই ঘটনা ঘটে তখন আমি জৌনপুরেই ছিলাম। জৌনপুরে থাকার কারণে লক্ষ্ণৌ-এর পূর্বেই আমার কাছে এই দুঃসংবাদ পৌঁছে যায়। সব কার্যক্রম বাতিল করে আমি জৌনপুর স্টেশন থেকে মোগলসরাই স্টেশনে পৌঁছোই। রেলস্টেশনে আমি ও মঙ্গলনগরের এক কার্যকর্তা যে কিনা স্টেশনেই থাকত, সে যদি না পৌঁছাতো পুলিশ কোনো বেওয়ারিশ ব্যক্তি মনে করে শবদেহকে কোথায় নিয়ে যেত? কি করত কিছুই বলা যেত না। কিন্তু আমাকে ওই কার্যকর্তা শবদেহের কাছে নিয়ে গেল। একেবারে নিথর দেহটি পড়ে আছে। পরে ধীরে ধীরে লোকেদের ভিড় জমতে শুরু করে। তাঁকে সামাজিক জীবনে আমি যেমন এনেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অন্তিম বিদায়ও আমাকে করতে হলো। অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হলো। ওঁর ও আমার বয়স প্রায় সমান সমান হবে। যদি তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দায়িত্বভার নিয়ে কাজ করতেন তো সবচেয়ে বড় দায়িত্ব অর্থাৎ সরকার্যবাহের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হোত। কারণ আমি যখন নাগপুর থেকে আসি এবং উত্তরপ্রদেশের প্রান্ত প্রচারক হই তখন ওঁর যোগ্যতা আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

**"পুনশ্চ হরি ওঁ"**

আজ দেশের পরিস্থিতিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ভারতীয় জনসঙ্ঘ কাজ করছিল কিন্তু ১৯৭৫ এর জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনেক রাজনৈতিক দল আবার একত্র হয়ে যায়। জনতা পার্টি নামে নতুন দল তৈরি হয়। জনতা পার্টি থেকে আবার ভারতীয় জনতা পার্টি নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমার আজও দৃঢ় বিশ্বাস যদি দীনদয়ালজী ওই কালখণ্ডে বেঁচে থাকতেন তো নিশ্চিতরূপে ভারতীয় জনতা পার্টিকে পুনর্বার ভারতীয় জনসঙ্ঘে পুনর্জীবিত করে তুলতেন। যেমন লোকমান্য তিলকের 'কেশরী' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর মাণ্ডালা জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর আবার তিনি কেশরী পত্রিকাতে প্রথম সম্পাদকীয় "পুনশ্চ হরি ওঁ" এই নামাঙ্কনে সম্পাদকীয় কলম লিখলেন। (অর্থাৎ আমি আমার কাজও পুনরায় শুরু করলাম)। সম্ভবত দীনদয়ালজীও সমস্ত ঘটনাক্রমের পর আবার পুনশ্চ হরি ওঁ বলে নিজের কাজ শুরু করে দিতেন বলে ওঁর সম্বন্ধে আমার তাই ধারণা। ধীরে ধীরে ভারতীয় জনসঙ্ঘের কাজকে তিনি প্রভাবশালী তো করতেনই 'একাত্ম মানব দর্শনের' দেশের নবপ্রজন্মের উদ্দেশ্যে এক নতুন দিকদর্শন তিনি তুলে ধরতেন। পদের পছনে তিনি কখনই দৌড়াতেন না বরং অনেক যোগ্য কার্যকর্তা নির্মাণের বিষয়ে তাঁর সবসময় আগ্রহ থাকত। দীনদয়ালজীর বিচার দর্শনের প্রভাবিত হয়ে যাঁরা প্রেরণা নিতে চান, প্রভাবিত হতে চান তাঁদেরকেও বর্তমান রাজনৈতিক নেতা হওয়া সত্ত্বেও দীনদয়ালজীর মতো শ্রেষ্ঠ আচরণ, সরল জীবন, ধ্যেয়নিষ্ঠা জীবনযাপন করতে হবে। কোনো পদ, যশ, মান্যতার উপর উঠে কাজ করার সংকল্প নিতে হবে। তাই দীনদয়ালজী ছিলেন একাধারে রাজনীতিজ্ঞ অন্য ধারে সন্তসম এক উচ্চমানের জীবন।"

শতবর্ষ উদযাপনের প্রাক্কালে সংস্তরণে তাঁর ওই উল্লিখিত পবিত্র জীবনদীপ থেকেও আমরাও নিজের জীবন যাতে আলোকিত করতে পারি শ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা।

উদযাপিত হচ্ছে সারাদেশব্যাপী পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ এবং তাঁরই প্রণীত 'একাত্ম মানব দর্শনের' অর্ধশতবর্ষ সমারোহ। জহুরি তো জওহর বা রতন চিনবেনই। এটাই স্বাভাবিক। সারাদেশ বিশেষ করে উত্তপ্রদেশে সঙ্ঘকাজের স্থপতি ও অনেক বিধিধ ক্ষেত্রের পথপ্রদর্শক স্বর্গীয় ভাউরাও দেওরস যিনি কিনা সবচেয়ে বেশি দীনদয়াজীকে জানতেন, বুঝতেন, ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, একসঙ্গে সুখে দুঃখে কাজ করতেন— এক কথায় 'ব্যক্তি দুই কিন্তু হৃদয় এক'। সেই স্বর্গীয় পণ্ডিত দীনদয়ালকে যদি সব থেকে কেউ বেশি জানতেন সেই স্বর্গীয় ভাউরাওজীর সংস্মরণ থেকে দীনদয়ালজীর সম্পর্কে দু-চার কথা তিনি যা বলেছেন তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো। বর্তমানকে অনেক জানেন কিন্তু অতীতের খবর আমরা কতজনই বা রাখি? সুদৃঢ় সুন্দর মন্দিরের ভিতের পাথরের কথা যাতে নবীন প্রজন্ম কিছু জানতে পারে, প্রেরণা পেতে পারে, রাষ্ট্র কাজে উদ্বুদ্ধ হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই অমূল্য ঐতিহাসিক এক সংস্মরণ অধ্যায়। অতীতের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্ন দেখে বর্তমানকে উপহার হিসাবে মনে করে আমাদের তরুণ প্রজন্মের এগিয়ে যাওয়ার পালা--- রাষ্ট্রনির্মাণের এক মহান সংকল্পকে হৃদয়ে পোষণ করে।

শতবর্ষে শতপ্রণাম।

***(গ্রন্থ ঋণ—প্রেরণা পুরুষ ভাউরাও)***

**'বিল্লদাকুঞ্জ'**

কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭

মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

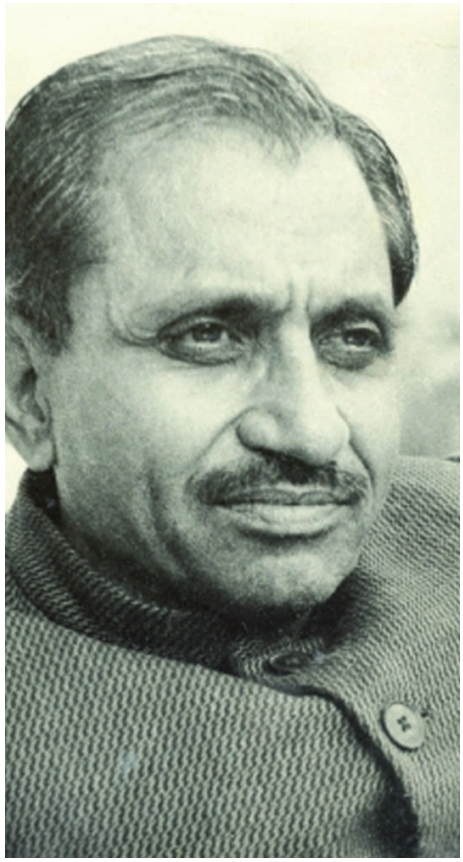

# রাজনীতির নিখাদ সোনা দীনদয়াল উপাধ্যায়

**তাপস দত্ত**

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির রহস্যময় মৃত্যু স্বাধীন ভারতে সংসদের ভেতরে ও বাইরে গণতন্ত্র চর্চায় হেনেছিল কুঠারাঘাত। বিরোধী রাজনীতিতে সৃষ্টি হয়েছিল গভীর শূন্যতা। কিন্তু তা অচিরেই পূরণ করেছিলেন তাঁরই মতো এক দূরদর্শী দীনদয়াল উপাধ্যায়। ঐতিহাসিক কাশ্মীর যাত্রার প্রাক্কালে ড. মুখার্জি বলেছিলেন, যদি এরকম দু'জন উপাধ্যায় থাকত। তাহলে শাসক দলের স্বৈরাচারী হয়ে ওঠা সম্ভব হোত না।

১৯৫১ তে ভারতীয় জনসঙ্ঘ গঠন করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। মহাসচিব পদে আনেন সর্বত্যাগী দীনদয়াল উপাধ্যায়কে। ১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচনে এই দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দলের সংসদীয় নেতা হন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। স্বাধীন ভারতে প্রথম সংসদীয় নির্বাচনের আগে ও পরে সংসদে তাবৎ বিরোধীদের নেতৃত্ব দেন তিনি। এদিকে ভারতীয় জনসঙ্ঘকে দেশজুড়ে শহরে ও গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেন দীনদয়াল উপাধ্যায়। মাত্র এক বছরের মধ্যেই কাশ্মীরে গ্রেপ্তার হয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আকস্মিক মৃত্যু (অনেকের মতে এজন্য দায়ী শ্রীনগর ও নয়াদিল্লী) সংসদে বিরোধী পক্ষের উপর বজ্রাঘাতের সামিল ছিল। এই পরিস্থিতিতে শহরে, গ্রামে সম্পূর্ণ ভারতীয়ত্ব ভিত্তিক বিরোধী রাজনীতিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন দীনদয়াল উপাধ্যায়। এজন্যই দলের সকলের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি হতে রাজি হননি। তিনি বুঝেছিলেন এখন সভাপতি হলে ভারতীয় জীবনচর্যা ও মূল্যবোধের আধারস্বরূপ এই দলকে শহরে গ্রামে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। আর এর ফলে স্বাধীনতার কৃতিত্ব দাবি করা শাসক দলটি হবে গণতন্ত্রের মোড়কে মারাত্মক স্বৈরাচারী দল। সভাপতি না হয়ে সাধারণ সম্পাদক পদে থেকে ভারতীয় জনসঙ্ঘের কাজে দেশময় পরিক্রমা শুরু হলো দীনদয়াল উপাধ্যায়ের। ট্রেনে, বাসে শুয়ে বসে ঘুম বা গল্প নয়। সংবাদপত্রের জন্য নিবন্ধ, সংসদে ভারতীয় জনসঙ্ঘের সাংসদদের জন্য ভাষণের সহায়ক লেখা প্রস্তুত করতেন উপাধ্যায়।

যদিও তাঁরই উদ্যোগে স্বাধীনতার আগেই লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত 'রাষ্ট্রধর্ম' মাসিক পত্রিকায় শুরু হয় তাঁর সাংবাদিকতা। আর এস এস-এর প্রচারক থাকার সময়ে তিনি এই সংগঠনের হিন্দি সাপ্তাহিক মুখপত্র 'পাঞ্চজন্য'র প্রকাশ ঘটান। যা এখনও চলছে। সেই সঙ্গে 'স্বদেশ' নামে দৈনিক পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হন। ট্রেনে, বাসেই তিনি লেখেন হিন্দিতে নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য' এবং শঙ্করাচার্যের জীবনী। মারাঠি থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করেন আর এস এস প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার-এর জীবনী। শীর্ণকায় অথচ বলিষ্ঠ মনের অধিকারী দীনদয়াল উপাধ্যায় ১৯৪৬-এ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এবং ১৯৪৭-এ জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য নাটক লেখেন। দেশমাতৃকা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দু'টুকরো হলে উপাধ্যায়ের মনে গভীর ক্ষত তৈরি হয়। এই ক্ষতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান অখণ্ড ভারত কিঁউ? (১৯৫২) লিখে। ক্রমে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা *ভারতীয় অর্থনীতি : বিকাশ কি দিশা* (১৯৫৮), *দ্য টু প্ল্যানস : প্রমিসেস, পারফর্মেন্সেস, প্রস্পেক্টস* (১৯৫৮), *রাষ্ট্রজীবন কি সমস্যায়ে* (১৯৬০), *ডিভ্যালুয়েশন : এ গ্রেট ফল* (১৯৬৬), *পলিটিক্যাল ডায়েরি* (১৯৬৮), *রাষ্ট্রচিন্তন, ইন্টিগ্রাল হিউম্যানিজম* এবং *রাষ্ট্রজীবন কি দিশা*। এর মধ্যে *ইন্টিগ্রাল হিউম্যানিজম* তথা *একাত্ম মানবতাবাদ* ইউরোপ ও আমেরিকার চিন্তাশীল ও মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে।

এক্সপ্রেস ট্রেন নয়, প্যাসেঞ্জার ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটে যাত্রাপথে চলত তাঁর লেখাপড়া। তাঁর প্রতিটি লেখা পাঠকের মনে সুগভীর রাষ্ট্রচিন্তার খোরাক যোগাত। ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি অর্গানাইজার'-এ পলিটিক্যাল ডায়েরি শীর্ষক তাঁর লেখা কলাম এই পত্রিকার বিদেশি পাঠকরা সাগ্রহে পড়ত। ভারতীয় জনসঙ্ঘকে তিনি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। যার ফলে ১৯৬৭-র নির্বাচনে শাসক (কংগ্রেস) পর্যুদস্ত

হয়েছিল বহু রাজ্যে। নিজ দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রাধান্য না দিয়ে দলের কর্মীদের মানোন্নয়নে জোর দিতেন তিনি। ১৯৬৭-র ১৯ ডিসেম্বর কালিকট শহরে দলের চতুর্দশ বার্ষিক সম্মেলনে তিনি সকলের দাবি মেনে সভাপতি হন। মহাসচিব পদ আর নয়, এই ছিল তাদের এক কথা।

এরপর মাত্র ৪৩ দিন। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ লক্ষ্ণৌ থেকে সন্ধ্যা ৭টায় রওনা দেন। গন্তব্য পাটনা। দলের ওয়ার্কিং কমিটির সম্মেলন রাত সওয়া দু'টোয় ট্রেন মুঘলসরাই পৌঁছোয়। আড়াইটায় ওই স্টেশন ছেড়ে পাটনার দিকে চলতে থাকে। চারদিকে কুয়াশার চাদর। ভোর পৌনে চারটায় অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারকে লিভারম্যান জানান, স্টেশন থেকে প্রায় দেড়শ গজ দক্ষিণে রেল লাইনের উপর ১২৭৬ নং ইলেকট্রিক পোলের কাছে পড়ে আছে এক পুরুষের দেহ। এ এস এম পুলিশকে জানালে ওই দেহ তুলে আনা হয়। চিকিৎসক জানান মৃত।

মৃতদেহ দেখতে লোক জড়ো হতে থাকে স্টেশনে। সকাল হয়ে গেছে। পাটনা স্টেশনে যারা উপাধ্যায়কে নিতে এসেছিলেন, তিনি নামছেন না দেখে তারা ট্রেনে উঠে খুঁজেও পাননি। মুঘলসরাই স্টেশনে এই মৃতদেহ কেউ চিনতে পারছেন না। মাইক্রোফোনে ঘোষণা হচ্ছে, কেউ ওই মৃতদেহ চিনতে পারলে যেন স্টেশন মাস্টারকে জানান। হঠাৎ কৌতূহলে একজন মৃতদেহের দিকে তাকিয়েই তীব্র চিৎকার করে বললেন, দেশে প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনসঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভাপতির মৃতদেহ। স্তম্ভিত স্টেশন মাস্টারসহ সবাই। ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টায় রেডিওর খবর জানিয়ে দিল 'রাজনীতির নিখাদ স্বর্ণ' দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন সমাপ্তির কথা। যিনি বলতেন পরিচিতি, ক্ষমতা, যশ অর্জনের লক্ষ্যে কারও উচিত নয় রাজনীতিতে আসা।

১৯১৬-র ২৫ সেপ্টেম্বর রাজস্থানে ধানকিয়ায় তাঁর জন্ম। আড়াই বছরে পিতার ও ৮ বছরে মায়ের মৃত্যু হয়। তারপর ছোট ভাই-এর মৃত্যু। ১৯৩৫-এ রাজস্থান মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম হন। নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁর কাছে সহজে অঙ্ক বুঝতে আসত দশম শ্রেণীর ছাত্ররা। জানতে পেরে সিকার রাজ মাসে ১০ টাকা স্কলারশিপ এবং বই কেনার জন্য ২৫০ টাকা দিয়ে পিলানির বিড়লা কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন। ১৯৩৭-এ সব বিষয়ে ডিস্টিংশন নিয়ে আই এস সি-তে প্রথম হন, ওই কলেজ এখন বিআইটি এস পিলানি নামে খ্যাত। উপাধ্যায়ের ওই রেকর্ড আজও অম্লান। ১৯৩৯-এ কানপুর থেকে প্রথম বিভাগে স্নাতক। ১৯৪১-এ আগ্রা থেকে ইংরেজিতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার প্রাক্কালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়া এক আত্মীয়কে বাঁচাতে পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। ইউপি সিভিল সার্ভিস পাস করেও বিডিও পদে চাকরিতে যোগ না দিয়ে শিক্ষকতার লক্ষ্য নিয়ে বিটি-তে ভর্তি হন। এর আগেই কিন্তু কানপুরে বিএ পড়ার সময়ে ডাঃ হেডগেওয়ারের সঙ্গে উপাধ্যায়ের পরিচয় হয়। ১৯৪২-এ বিটি পাস করে নাগপুরে আর এস এস-এর তৃতীয় বর্ষের প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রচারক হন। শাসক দল স্বৈরতন্ত্রী হয়ে উঠেছে দেখে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ১৯৫১-তে ওই সামাজিক সঙ্ঘের সহায়তা চান। অধ্যাপক গোলওয়ালকর তখন বিনা সুদে ঋণরূপে দীনদয়াল উপাধ্যায়-সহ কয়েকজন মেধাবী প্রচারককে পাঠান ড. মুখার্জির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনসঙ্ঘকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিতে। এরপরের অধ্যায়টা স্বাধীনোত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে অপরিহার্য অংশ।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যু এখনও রহস্যাবৃত। মোগলসরাই স্টেশনে তিনি ওই ট্রেন থেকে নামেননি। কারণ নামার প্রয়োজন ছিল না। বই ও পোশাক সহ তাঁর স্যুটকেস পাটনা স্টেশনে ওই ট্রেন থেকে উদ্ধার হয়েছিল। গোয়েন্দাদের অনেকের মতে, চলন্ত ট্রেনেই অজ্ঞাত আততায়ীদের আঘাতে অজাতশত্রু দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। হত্যার পর আততায়ীরা স্টেশনের বাইরে তাঁর মৃতদেহ রেখেছিল। তাঁর নামে সম্প্রতি কয়েকটি জাতীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচি শুরু হয়েছে। কিন্তু কেন এই দেশহিতব্রতীকে হত্যা, তা জানতে চায় সাধারণ মানুষ। ■

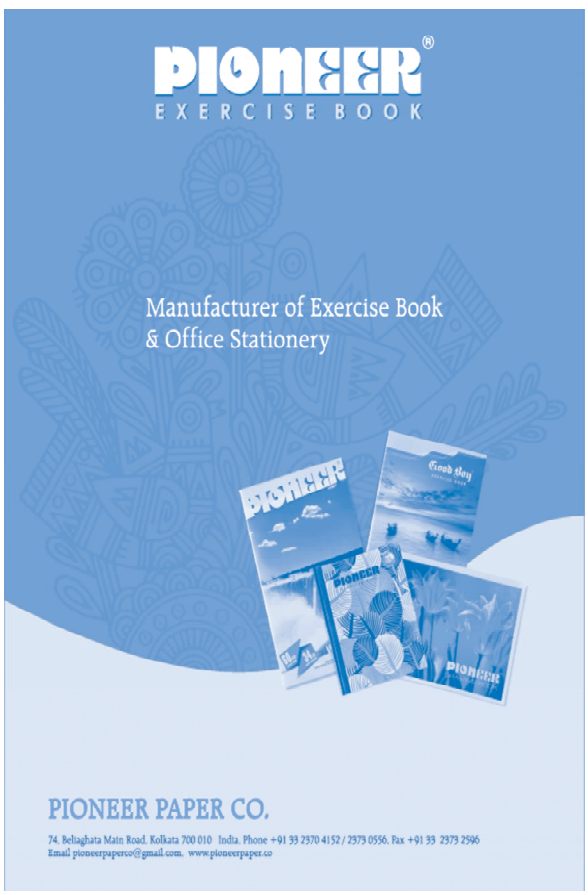

# একাত্ম মানবদর্শন ও উনিশ শতকের বঙ্গ মনীষী

**অমলেশ মিশ্র**

মানুষ এবং তার চারিদিকে যত ও যাবতীয় জীব বা জড় আছে, তাদের এবং তাদের মধ্যে সীমাহীন বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও, সবই এবং সকলেই একাত্ম। সমষ্টিগতভাবে এক ও অভিন্ন। যে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা আমরা দেখি এবং দেখতে পাই সেগুলি বাহ্যিক, উপর উপর, ভাসা ভাসা, অগভীর, যদিও তা স্বাভাবিক। এই একাত্ম ও অভিন্নতার কারণেই সব কিছু এবং সকলে পরস্পরের সহযোগী, সম্প্রীতিবদ্ধ এবং পরিপূরক। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মধ্যেই একই আত্মা (Soul) বিরাজমান। একাত্ম মানববাদ বা একাত্ম মানব দর্শনে ব্যক্তি ও অন্য যাবতীয় অস্তিত্বের (জীব ও জড়) সঙ্গে এই বিশ্ব আত্মার অবিচ্ছেদ্য সংযোগের বিষয় বিবৃত হয়েছে। ভারতের দর্শনগুলির মধ্যে অদ্বৈতবাদ দর্শনই হলো একান্ত মানবদর্শনের ভিত্তি।

প্রথমত, ইংরাজরা এদেশের শাসনভার ছেড়ে দেওয়ার পরে এটা স্বাভাবিক ছিল যে, আমরা তাদের আদর্শ, তাদের সামাজিক চিন্তা, তাদের রাজনৈতিক ভাবনা ও প্রভাব থেকে ধীরে ধীরে হলেও মুক্ত হব। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে আমাদের উপর তাদের প্রভাব বাড়ছে। আমরা আমাদের দেশকে আর ভারতীয় অর্থাৎ দেশজ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি না। আমরা আমাদের দেশকে দেখছি বিদেশিদের চোখে। আমরা ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করে গর্বিত হই, তাদের আচার-আচরণকে আদর্শ বলে গ্রহণ করি। তাদের পোষাক-আশাক, খাদ্যাভাস পছন্দ করি। ব্যতিক্রম একটাই যে, তারা যখন বলে— আমরা ইংরেজ জাতির লোকেরা জার্মানি গঠন করেছি, আমরা আরবি জাতির লোকেরা আরব গঠন করেছি— তখন আমরা তা মেনে নিই; কিন্তু যখন বলা হয় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি বা আরবের মতো, আমরা হিন্দু জাতির দেশ নয়, বহু জাতিক দেশ, তখন আমরা এই বাক্যকে ধ্রুব বলে মনে করি।

দ্বিতীয়ত, বিদেশিদের সমাজ-বিজ্ঞানকে, তাদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তাভাবনাকে আমরা আমাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছি। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতি, সংহিতা সবই আমরা এক পাশে সরিয়ে রেখেছি। মিল, বেন্থাম, কার্লাইল, হেগলে, অ্যাডাম স্মিথ, মার্কস, এঙ্গেলস প্রমুখ কী বলেন ও বলেছেন আমরা তাই ভাবি এবং তাই-ই করি।

তৃতীয়ত, তাঁরা বলেছেন— সংঘর্ষ ও সংগ্রামই পৃথিবীর অগ্রগতির ইতিহাস। এই সংঘর্ষ ও সংগ্রামে যে জিতবে, সে বাঁচবে। আর কারোর বাঁচার অধিকার নাই। তারা বলেন— প্রকৃতির যাবতীয় সম্পদ সবই নিংড়ে নিয়ে আমাদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটাতে হবে। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে— বিরোধ, সংগ্রাম, রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। আমরা এই কথাগুলি মেনে নিয়েছি।

চতুর্থত, একান্ত মানববাদ এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। সংঘর্ষ- সংগ্রাম-রক্তপাত সময় বিশেষে প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সেটাই বিশ্বের নিয়ম নয়। মানুষ মানুষের বন্ধু, মানুষ সমাজের অংশ এবং বন্ধু। মানুষ জাতি এবং দেশের অংশ এবং বন্ধু, মানুষ সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অংশ এবং বন্ধু। সকলেরই বাঁচার অধিকার আছে। একজন অপরজনের শত্রু নয়, পরিপূরক। সারা ব্রহ্মাণ্ড এক বিশ্ব আত্মা। সেই এক থেকে বহু-র সৃষ্টি। যাবতীয় বৈচিত্র্য সেই আত্মাকে কেন্দ্র করেই। ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য। এটাই ভারতবর্ষের চিতি বা Ethos।

পঞ্চমত, প্রত্যেক দেশ বা জাতিরই নিজস্ব ভাবসত্ত্বা, মানবসত্ত্বা ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই ভাব সত্ত্বা বা চিতি নিয়ে সেই দেশের গঠন হয়। পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধ শুধু হস্তান্তরিত ক্ষমতা ভোগের জন্য নয়, দেশকে/জাতিকে তার চিতি অনুসারে পুনর্গঠনই স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্য। ধরে নেওয়া হয় যুদ্ধ সংগ্রাম করে স্বাধীনতা লাভের পর, সেই দেশ নিজস্ব Ethos, নিজস্ব চিতি, নিজস্ব আত্মা (Soul) নিয়ে বাঁচার সুযোগ পাবে।

ষষ্ঠত, যে দেশ বা জাতি এমন পথ অনুসরণ করে, এমন চিন্তায় ভাবিত ও প্রাণিত হয় যা তার নিজ বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও সত্ত্বার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সেই দেশ বা জাতি সমস্যাসঙ্কুল হবেই। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

সপ্তমত, বিগত এক হাজার বছর ধরে আমরা ব্যস্ত ছিলাম বিদেশিদের আক্রমণ ও আধিপত্য থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে, নিজেদের দেশের Ethos বা চিতি অনুসারে বাঁচা সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে। আজ যখন আমরা শাসন ব্যবস্থা নিজেদের হাতে পেয়েছি, আমাদের কাজ হলো নিজের দেশের Ethos (ভাবসত্ত্বা, মানসসত্ত্বা, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য) অনুসারে বাঁচা ও সমৃদ্ধির চেষ্টা করা।

অষ্টমত, আমাদের দেশের মনীষীদের মধ্যে বিশেষ করে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রী অরবিন্দ বারবার বলেছেন যে, সমগ্র পৃথিবীকে ভারতবর্ষের কিছু দেওয়ার আছে। সেই দেওয়ার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ সারা বিশ্বে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারবে। খুব সহজভাবে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কী সেই বস্তু যা সারা বিশ্বকে ভারতবর্ষ দিতে পারে? সহজ উত্তর হলো— একান্ত মানববাদ দর্শন। এই একান্ত মানববাদের শিক্ষাই আমরা সারা বিশ্বকে দিতে পারি। স্বামীজী তাঁর চিকাগোর বক্তৃতায় বিশ্বের সামনে এই পথেরই নির্দেশ দিয়ে বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন, 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মত বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'

নবমত, এই দর্শন এমনই যা (ক) একজন ব্যক্তিকে, (খ) একটি পরিবারকে, (গ) একটি সমাজকে, (ঘ) একটি জাতি ও দেশকে, (ঙ) সমগ্র বিশ্বকে দেবে : (১) শান্তি, (২) সুখ, (৩) প্রগতি, (৪) বাহ্যিক ও মানসিক সম্পদ। একান্ত মানববাদ দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া এবং পরিচালিত করা আমাদের কাজ।

দশমত, এই দর্শন অনুসারে, সেই একজন আদর্শ মানুষ যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারটি পুরুষার্থ অনুসারে নিজের জীবন পরিচালনা করেন। দেহ, মন, বুদ্ধি এবং আত্মার বিকাশ এই পথেই হয়। এই দেহ, মন, বুদ্ধি, আত্মা ব্যক্তির মতো পরিবার, সমাজ, দেশ, বিশ্ব এবং ব্রহ্মাণ্ডেরও আছে। ব্যক্তির চার পুরুষার্থের মতো, পরিবার, সমাজ, দেশ,

বিশ্বেরও চার পুরুষার্থ আছে। মূলত একই আত্মার বহুমুখী বিকাশ। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে, প্রত্যেকে প্রত্যেকটির সঙ্গে, প্রত্যেকটি অন্যটির সঙ্গে যুক্ত। পরস্পর সহযোগী, সম্প্রীতিবদ্ধ ও পরিপূরক।

একাদশত, পণ্ডিত দীনদয়ালজী—একাত্ম মানব দর্শন নিয়ে কোনো পৃথক পুস্তক রচনা করেননি। তাঁর রচিত বিভিন্ন সন্দর্ভ ও নানা বৌদ্ধিক ভাষণ থেকে এই তত্ত্ব আমরা পেয়েছি। শ্রী বিনায়ক বাসুদেব নেনে দীর্ঘ চার বছরের পরিশ্রমে পুস্তক আকারে এটি রচনা করেন এবং ১৯৮০ সালে সুরুচি প্রকাশন পুস্তকটি প্রকাশ করে।

দ্বাদশত, ভারতের নব জাগরণে বাঙালি মনীষীদের অনেকের মধ্যেই একাত্ম মানববাদ দর্শনের চিন্তা বীজ হিসাবে ছিল। কিন্তু এই দর্শনকে আজ আমরা ১৯৮০ সালে যে নামে প্রকাশিত হতে দেখলাম, সেই নামে সেটি পরিচিত ছিল না। অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী মাত্রেরই এই জ্ঞান থাকা স্বাভাবিক। বাঙালিদের মধ্যে যে অসংখ্য মনীষী ভারতের নবজাগরণে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের পাঠ নিয়েছিলেন। তাঁদের কর্মে এবং কথায় তার প্রকাশ ঘটেছে।

ত্রয়োদশত, আজ এই পরিসরে সেই অসংখ্য মনীষীর উল্লেখ সম্ভব নয়। আমি মাত্র দশ জন বাঙালি মনীষীর নাম উল্লেখ করব। তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায় অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে জন্মগ্রহণ করেন, বাকিরা সকলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি। তাঁদের নাম ও জন্ম সাল উল্লেখ করছি। ভারতের নবজাগরণে এঁদের ভূমিকা ছিল অনবদ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ। যথা, (ক) ভারত পথিক রামমোহন রায় (১৭৭২), (খ) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০), (গ) ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮), (ঘ) মহামহোপাধ্যায় শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭), (ঙ) শ্রী রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮), (চ) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১), (ছ) স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩), (জ) শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪), (ঝ) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪) এবং (ঞ) ঋষি শ্রী অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২)।

চতুর্দশত, এই মনীষী ও মহাপুরুষদের সম্যক বৃত্তান্ত এখানে আলোচনার সুযোগ নাই। তাই এঁদের প্রত্যেকের বিষয়ে দু' একটি বিষয় উল্লেখ করেই লেখা শেষ করব। এঁরা প্রত্যেকেই আত্মার একত্বে বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তি জীবনে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষর পুরুষার্থ মানতেন। দেহ, বুদ্ধি, মন ও আত্মার সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণা থাকলেও তা যে সমাজ, দেশ এবং বিশ্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য একথা খুব স্পষ্ট ভাবে কোথাও বলেছেন বলে মনে হয় না। একাত্ম মানব দর্শনের যে সামূহিক রূপটির কথা আমরা আজ আলোচনা করছি— এঁরা কেউই এই দর্শন এমন ভাবে ব্যাখ্যা করেননি। এই বিষয়ে অধিক সময় ব্যয় করার সুযোগও তাঁদের ছিল না। তাঁদের জ্ঞান ছিল, ভক্তি ছিল, কর্ম ছিল। এগুলির মধ্যে তাঁরা কর্মকে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের নিঃশেষ করেছেন।

(ক) রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ছিলেন বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। কুসংস্কার, জাত-পাত ও ধর্ম উন্মাদনার ঘোরতর বিরোধী। মানস উন্নয়ন ও বিশ্ব মানবতা উপলব্ধির (Contemplation of the Author and Preserver of the Universe) কথা বলেছেন। ১৮২৬-এ কলকাতার মানিকতলায় বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা— তাঁর বহুতর কর্মের মধ্যে একটি।

(খ) পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯০) কখনও এই সব দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে কোনো কথাই বলেননি বা লেখেননি। তাঁর রচিত শিশু শিক্ষার পুস্তক 'বোধোদয়'-এ ঈশ্বর সম্পর্কে লিখেছেন— ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়েছেন। এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি তাহা তিনি দেখিতে পান, আমরা যাহা মনে মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু। তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা।

(গ) ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪০)-র 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র সারা দেশকে উজ্জীবিত করেছিল। দেশ বা মাতৃভূমিকে জননী হিসাবে দেখার শিক্ষা তদানীন্তন ভারতবর্ষীয়দের তিনিই দিয়েছিলেন। তিনি যোদ্ধা ভারতবাসীর কথা স্মরণ করিয়েছেন। সমাজ ও দেশের একটি আত্মা আছে— এই ধারণাটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় পরিস্ফুট। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন— 'বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু করিয়েছেন, সব কিছু গিয়ে একপদে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা— জন্মভূমিকে 'মা' বলা, জন্মভূমিকে ভালোবাসা, জন্মভূমিকে ভক্তি করা।'

শ্রী অরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০) লিখেছেন— The intellectual idea of the Motherland is by itself is not a driving force... It is not till not the Motherland reveals herself to the eye of the mind as something more than a stretch of earth or a mass of individuals, it is not till it takes a shape as a great divine and Maternal Power।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতরাম উপন্যাসে কিরূপ অনুশীলনে স্বদেশের মুক্তি সাধন সম্ভব তার সন্ধান দেশবাসীকে দিয়েছেন। এই তিন উপন্যাসে তিনি বাঙালির প্রকৃতির আধারে ব্যষ্টি, সমষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন পদ্ধতি পরিস্ফুট করেছেন। একাত্ম মানববাদের বীজ বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে খুব স্পষ্ট করেই প্রতিভাত হয়।

(ঘ) শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)-র গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্ম হলেও হিন্দুদের কুসংস্কার, জাত-পাত, মানুষে মানুষে বিরোধ তাঁকে এতটাই বিদ্বিষ্ট করেছিল যে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। বৈপ্লবিক সমিতি গঠন করে জাতীয়তামূলক, সমাজ-সংস্কারমূলক, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতামূলক কাজকর্ম, জাতিভেদ অস্বীকার, নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রভৃতি করে গেছেন। তিনি সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম ধর্মভুক্তরা সকলেই সেই এক পরমব্রহ্মের উপাসনা করেছেন। শিবনাথ তার বাইরে নন। এই একই ব্রহ্মের ধারণা একাত্ম মানব দর্শনের মূল কথা।

(ঙ) রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) একাধারে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সিভিলিয়ন। বেদগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ তার অন্যতম কীর্তি। এই কাজ প্রমাণ করে যে তিনি ভারতীয়তার প্রতি কতটা দায়বদ্ধ ছিলেন। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যা তাঁর সাহিত্যকীর্তির উজ্জ্বল নমুনা এবং প্রমাণ যে একাত্ম মানববাদ দর্শন ও জাতীয়তা বোধ তাঁর মধ্যে কতটা ক্রিয়াশীল ছিল।

(চ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) জাতীয়তা, মানবতা, বিশ্বজনীনতা, মানবের

সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের যোগ এবং সব কিছুর একাত্মতা প্রসঙ্গে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। বিষয়টিকে কেবল তাত্ত্বিক স্তরে না রেখে তা ব্যবহারিক স্তরে এনেছিলেন। পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব এবং তাতে বিশ্বাস, বিশ্বের একাত্মতা তাঁর ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্য সৃজনে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। আমি কেবলমাত্র সকলের পরিচিত রবীন্দ্র সঙ্গীতের থেকে তিনটি গান উল্লেখ করছি।

(১) আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি, পেয়েছি মোর স্থান...

চলমান সাধনার প্রতি পদক্ষেপেই একাত্ম মানববাদ দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। বিবেকানন্দের অভিব্যক্তি এবং ব্যাপ্তি, পণ্ডিত দীনদয়ালজীর থেকে মাত্রায় অনেক বিস্তৃত হওয়ায়, বিশ্বের দরবারে একাত্ম মানববাদ দর্শন বিবেকানন্দ পৌঁছে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরতত্ত্ব বা পরমব্রহ্ম তত্ত্বে বিশ্বাসী যে কোনো মানুষের কাছে ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য তত্ত্বটি গ্রহণ ও বিশ্বাসযোগ্য। আমরা নিজেরা সব কিছু বিশ্লেষণ করতে পারি না। তাই বিবেকানন্দের মতো মানুষেরা যখন নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, জীবন সাধনায় তা প্রয়োগ

জীবনযাত্রায় প্রয়োগ করেছিলেন। এঁরা দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। স্বদেশপ্রেমী, স্বাভিমানী এই দুই যুগপুরুষ কুসংস্কার ও জাতপাত ব্যবস্থার একান্ত বিরোধী ছিলেন।

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ— এই চার পুরুষার্থ নিয়ে কোনো ধর্মালোচনা করেননি, পুস্তক রচনাও করেননি, তবে তাঁদের জীবনযাত্রা এই চার পুরুষার্থ আশ্রয় করেই প্রবাহিত হয়েছে।

(ঞ) অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) একাধারে বিপ্লবী রাজনীতিক, যোগী এবং

(২) তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া
আমার অঙ্গ, তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ। ও তার অন্ত নাইগো নাই...

(৩) সবারে আমি নমি। যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ, দিয়েছ তার পরিচয় সবারে আমি নমি।

(ছ) বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)-র বিষয় রবীন্দ্রনাথ-এর মতোই এত বিশাল যে দু'চার কথায় সব বলা সম্ভব নয়। তাই কেবলমাত্র নামটুকুই উচ্চারণ করলাম।

একাত্ম মানব দর্শন, পণ্ডিত দীনদয়ালজী কয়েকবছর ধরে তার নিজের ভাষণে ও লিখিত সন্দর্ভগুলিও ব্যক্ত করেছেন। বিবেকানন্দ আমাদের কাছে তত্ত্ব হিসাবে একাত্ম মানববাদ দর্শন উপস্থিত করেননি। কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, ভাষণে, লিখনে, কর্মধারায় ও

করেন, তখন হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করার পর সেই তত্ত্ব অভ্যাস করার কাজটি হয়ে উঠে না।

(জ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), (ঝ) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪)— এই দুই বাঙালি মনীষী সারা জীবনে বহুবিধ ও বিচিত্র কর্মকাণ্ডে সারা দেশকে মুগ্ধ করেছিলেন। প্রগতিশীলতা বলতে কাজেকর্মে কী বোঝায় তার দিক দর্শনও এঁরা দিয়েছেন। দু'জনেই তাঁদের বিশ্বাস পরমাত্মায় স্থাপন করেছিলেন এবং বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বমানবতায় গভীর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। স্বাদেশিকতা এবং বিশ্ব মানবতা যে পরস্পর শত্রু নয়— এ বিশ্বাস তাঁরা তাঁদের বহুমুখী কর্মের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। একাত্ম মানবদর্শন নিজেদের

দার্শনিক। যার জন্য তাঁকে 'ঋষি অরবিন্দ' বলা হয়ে থাকে। Mother India, Life Divine, The Secrets of the Vedas, Savitri তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির অন্যতম। একাত্ম মানববাদ দর্শন তাঁকে যে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল তা এই সব রচনাগুলি থেকে বোঝা যায়। আলোচনা এখানেই শেষ করছি। পণ্ডিত দীনদয়ালজীর একাত্ম মানববাদ দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনগুলির পার্থক্য অতি সহজে বুঝতে হলে এই রেখচিত্র দু'টি মাথায় রাখতে হবে। পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যক্তি মানুষ থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন-দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রামে লিপ্ত হতে পারে। একাত্ম মানববাদ দর্শনে ব্যক্তি মানুষ থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কখনও বিচ্ছিন্ন নয়। পাশ্চাত্য দর্শন সমকেন্দ্রিক বা Concentric। একাত্ম মানববাদ দর্শন চক্রিল বা Spiral।

# ভারতীয় কূটনীতি ও মোদী

২০১৫-র ২৫ ডিসেম্বর, স্মরণীয় দিন হয়ে থাকল। বড় দিনের উৎসবমুখর বৈকালিক সন্ধিক্ষণে নওয়াজ শরিফের জন্মদিনে, এই লাহোরেই আগে মৈত্রীর হাত যিনি এগিয়ে রেখেছিলেন সেই অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে— এক দুর্লভ মুহূর্তে পুনর্বার বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে পাকিস্তানের মাটিতে বুক চিতিয়ে আগুয়ান হয়ে বিশ্বকে চমকে দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিগত কংগ্রেস শাসনের দশ বছরের দু'টি মেয়াদে প্রয়াস ও অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ যা করতে পারেননি, সেখানে একটি ফোনের আমন্ত্রণে অক্লেশে পৌঁছে গেলেন নরেন্দ্র মোদী।

১৯৯৮ সালে কী হয়েছিল বা ২০১৫ সালে কী হলো সেই বিতর্কে না থেকে এটা বুঝতে হবে খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থেকেও পাকিস্তানের মুশকিল হলো পাকিস্তান 'একটা' পাকিস্তান নয়। পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকার এবং সাধারণ মানুষ যা বুঝতে পারে এবং যা চায় তাদের মাথার উপর ক্রমাগত ছড়ি ঘোরানো পাক সেনাবাহিনী, আই এস আই এবং মোল্লাতন্ত্র তা বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না। তাদের বিষ নিঃশ্বাস পাকিস্তানের উপর প্রবাহিত হবেই। কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে প্রচেষ্টারত ভারত সরকারকেও শাঁখের করাতের উপর দিয়েই, সমালোচনার গহনতার মধ্য দিয়েই যেতে হবে।

আমেরিকা সহ রাষ্ট্রপুঞ্জ মোদী এবং শরিফের বন্ধুত্বের উষ্ণতাকে স্বাগত জানিয়েছে। পাকিস্তানের মানুষকে রক্ষা করতে হলে ওই দেশের শাসককে বিষ নিঃশ্বাস বাঁচিয়ে, বিদেশি গ্রাস এবং রক্তচক্ষুর তীক্ষ্ণতা বাঁচিয়ে উদার বন্ধুত্বে পরিপূর্ণ প্রতিবেশীর হাতে হাত রাখা ছাড়া কোনো উপায় নেই। দেরি করলে পাকিস্তানেরই বেশি ক্ষতি। অন্যদিকে খুবই আশা ও দৃঢ়তার

সঙ্গে বলা যায় খণ্ডিত ভারত আবার অখণ্ড ভারত হবে— এমন ভাবনার ঊষাকালের সূচনা-সন্ধান কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে হলেও আগুয়ান হতে শুরু করেছে। যে পথকে বিগত দিনে কণ্টকিত করা হয়েছিল, একটা একটা করে কাঁটা তুলে ফেলার কাজ যখন শুরু হয়েছে তখন মসৃণ পথ একদিন হবেই। ভাঙা-গড়ার নিত্য কর্মরত প্রচেষ্টা একদিন সফলতার দিকে এগিয়ে একটি সম্পূর্ণ মজবুত শক্তিশালীবৃত্ত তৈরি করবে। সেদিনের সেই মজবুত বৃত্তই হবে অখণ্ড ভারত। আর সেই অখণ্ড ভারতই বিশ্বে মহান হয়ে উঠবে।

**—অমিত ঘোষ দস্তিদার,**
নতুনপল্লী, সোনারপুর।

# সংরক্ষণ নীতির সংস্কার

যুগ যুগ ধরে একটা নীতি কথা চলে আসছে— 'প্রিয়ংবদ, অপ্রিয়ং মা বদ' অর্থাৎ প্রিয় কথা বলো, অপ্রিয় কথা বলো না। এমন কি অপ্রিয় কথা যদি সত্যও হয়, তাও বলো না। বলাবাহুল্য এই ধরনের ভ্রান্ত নীতিকথা আমাদের ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে এসেছে। তাই অপ্রিয় সত্য কথাটি কেউ বলে ফেললে 'গেল গেল' রব তুলে আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বিপদ সাইরেন বাজাতে শুরু করেন। আর আমাদের অধিকাংশ দেশবাসীরা তাতে ভীত, সন্ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন, হয়ে পড়েন।

মেকলে সাহেব প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি ও বিজাতীয় ভাবধারা অধিকাংশ দেশবাসীকে শান্ত, নিরীহ, দুর্বল, ভীরু ও আত্মসর্বস্ব করে তুলেছে। তাই যে অপ্রিয় সত্য দেশ ও জাতির হিত সাধন করতে পারে, সমাজের প্রগতি ত্বরান্বিত করতে পারে— তার নিরপেক্ষ ও যুক্তিযুক্ত পর্যালোচনা না করে সেই অপ্রিয় সত্যের কণ্ঠরোধ করার জন্য বৃহত্তর সমাজ থাকে সদা সক্রিয়।

লিও টলস্টয়-এর 'The Naked King'-এর এক সরল, সত্যবাদী ও সাহসী শিশুর মতো আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতজী একটি অপ্রিয় সত্য কথা বলে ফেলেছেন— ''বর্তমান সংরক্ষণ বিধিতে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে যারা সুবিধাভোগী অংশ তারাই এক তরফাভাবে সুবিধা পেয়ে আসছে। পিছিয়ে পড়া বর্গের মানুষজন যাদের জন্য এই সংরক্ষণ বিধি সুনির্দিষ্ট তাদের এক বিরাট অংশ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত।''

মোহনজী অকপট সত্য কথাটিই বলেছেন। তিনি ভুল কিছু বলেননি। তিনি ঠিকই বলেছেন। আর এই ঠিক কথা বলাটা যদি একটা রাজ্যের পট পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হয় তা খুবই দুর্ভাগ্যের।

''সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।'' ভারতের পরিত্রাণের জন্য সত্য বাক্য বলতে পারেন— মোহন ভাগবতের মতো এমন কিছু মানুষ।

সংরক্ষণ নিয়ে ভারত জুড়ে যে হীন ও কুৎসিত রাজনীতি শুরু হয়েছে তাতে মনে হয়, সংরক্ষণের প্রবক্তা ড. আম্বেদকর বেঁচে থাকলে লজ্জায় মুখ দেখাতেন না। বর্তমানে ভারতের সংহতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিপজ্জনক বিষয় হলো সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

লেখক তারক সাহা মহাশয়ের 'বর্তমান কাঠামোয় সংরক্ষণ বিধি অসাংবিধানিক' (স্বস্তিকা-১৪.১২.১৫) শীর্ষক প্রবন্ধটি খুবই সঙ্গত ও যুক্তিগ্রাহ্য। মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্যকে সমাজের সকল স্তরের মানুষ, সরকার ও রাষ্ট্রনেতাদের মান্যতা ও মর্যাদা দেওয়া উচিত। রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থবাহী, দেশ ও জাতির কাছে অনিষ্টকর, সমাজ প্রগতিহীন, একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট সংরক্ষণ নীতির সংস্কার হোক।

**—রোমিল আচার্য,**
সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

# অঙ্ককষা নৈতিকতার বাণী জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে

**কে. এন. মণ্ডল**

সাম্প্রতিককালে কিছু বুদ্ধিজীবী নানা মনীষীর ভিন্ন প্রেক্ষিতে কিছু বক্তব্য নিজেদের বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে, প্রজ্ঞাবান উপদেশাবলী বিতরণ করছেন গরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের বিপথ চালিত নরাধমদের উদ্দেশ্যে। আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু মূলত নরেন্দ্র মোদীর সরকার বা সমর্থকেরা। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ, মূল অ্যাজেন্ডা হিন্দুত্ব বা অসহিষ্ণুতা।

লক্ষণীয়, বর্তমান ভারতের নীতিহীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে রাজনীতিকদের সামন্ততান্ত্রিক হালচাল, সমাজবিরোধী যোগসাজশ, গণতন্ত্রের নামে সিন্ডিকেটরাজ এবং লুম্পেন আস্ফালন সমাজজীবনে অস্থিরতা সৃষ্টি করে জঙ্গলরাজ কায়েম ইত্যাদি ঘটনা এ সমস্ত বুদ্ধিজীবী (Pseudo secularist)-দের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় অথবা রাজানুকূল্যের আশায় তাঁরা চোখ বুঁজে থাকেন।

আসলে সমস্যাটা হচ্ছে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সহজাত অসহনশীলতা। এই অসহনশীলতা নরেন্দ্র মোদীর বর্ধিত জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। যখনই তাঁকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করা যাচ্ছে না, তখনই মেকি ধর্মনিরপেক্ষীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আক্রমণ শানাচ্ছে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার অলীক গল্প ফেঁদে। এরা আফজল গুরুদের ফাঁসিতে কাঁদেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত মুসলমান মৌলবাদের যথার্থতা প্রমাণে দাদরির মতো অনভিপ্রেত দুর্ঘটনার আশ্রয় খোঁজেন।

একথা ঠিক, বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদী সর্বাপেক্ষা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার (Most misunderstood Politician)। তার দেড় বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বে কোনো রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করেননি, কোনো নির্বাচিত সরকারকে গদিচ্যুত করেননি। এমনকী সুযোগ থাকতেও দিল্লীতে নিজেদের সরকার না গড়ে, নির্বাচন দিয়ে কেজরিওয়ালকে ক্ষমতায় আসার সুযোগ করে দিয়েছেন। তার দল কোনো রাজ্যের নির্বাচন অবৈধ উপায়ে বা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মাধ্যমে ভোট লুট করেনি, তারপরেও মোদী স্বৈরাচারী ও অসহনশীল এই অভিযোগ।

অনেকেই (কংগ্রেস এবং বিজেপি বিরোধী দলগুলি) কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ আনছে। কিন্তু ১৮ মাসের মোদী সরকারের কাজে সংবিধানের কোন ধারাটি লঙ্ঘিত হয়েছে বলছেন না। আসলে দুর্নীতি, স্বজন-পোষণ বা দেশদ্রোহী কাজে পরোক্ষভাবে ইন্ধন যোগানের জন্য দায়ী শাসকরা তাদের নির্বাচকমণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করার জন্যই মোদী জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন। সিবিআই, এন আই এ-এর মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে তাই এতো রোষ। নরেন্দ্র মোদী নাকি এ সমস্ত তদন্তকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছেন— ঘটনা পরাম্পরা তাই কি প্রমাণ করে? দাদরির ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার কি উত্তরপ্রদেশ সরকারকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইন প্রয়োগে বাধা দিয়েছেন? তাহলে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ কেন ক্ষুব্ধ এবং অসহনশীলতার দায়ে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন? আজকের যাঁরা আমির খানের হয়ে গলা ফাটাচ্ছেন তাঁরা কি একবারও ভেবেছেন তাদের বক্তব্যের সারবত্তা কি? তাঁরা কি মনে করেন ভারতের চেয়ে অন্য কোনো মুসলমান রাষ্ট্র বেশি পরধর্ম সহিষ্ণু বা নিরাপদ? ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বা হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে কথা বলাই তথাকথিত মুক্ত চিন্তার ধারকরা প্রগতিশীলতার ট্রেডমার্ক মনে করেন--- তাতে যদি 'বন্দেমাতরম্'-এর বিরোধিতা করতে হয় তাও স্বীকার। মনে রাখতে হবে, ভারতীয় হিন্দু সমাজ সহনশীল বলেই ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ মুসলমান ভারত ভূখণ্ডের ১৭ শতাংশ ভূমি পাকিস্তান হিসেবে উপহার পেয়েছেন। অথচ মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশ ভারতেই থেকে গেছে। ভারতীয়রা সহনশীল বলেই, গত ৫০ বছরে ১ কোটিরও বেশি পাকিস্তানি/বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপূর্ব ভারত, দিল্লী বা মুম্বইবাসী হয়েছে (এদের কেউ কেউ আবার ভারত বিরোধী কাজে লিপ্ত), অথচ ওই সময়ের মধ্যে কোনো মুসলমান পাকিস্তান বা বাংলাদেশে যেতে বাধ্য হয়নি— দাউদের মতো কিছু দেশদ্রোহী ছাড়া। এ প্রসঙ্গে ৬ ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় মুক্ত চিন্তার লেখিকা তসলিমা নাসরিনের 'এ আবার নতুন কি' কলমে লেখা বক্তব্যটি উল্লেখ্য। 'হয়তো অনেকে মনে করেন মুসলমান মৌলবাদীদের চেয়ে হিন্দু মৌলবাদীদের গালাগালি দেওয়া নিরাপদ'—এটাই বাস্তব অবস্থা।

Pseudo Secularist বা মেকি--- ধর্মনিরপেক্ষদের সওয়াল যার-যা-খুশি খাবেন তাতে অন্যের বা রাষ্ট্রের কী? এটি একটি অতি সরলীকরণ বক্তব্য এবং আইনগতভাবে ভ্রান্ত। ইচ্ছা করলেই কি প্রকাশ্য স্থানে মদ খাওয়া যায়, না প্রিয় খাদ্য বলে হরিণের মাংস বা কচ্ছপের মাংস মেনুতে রাখা যায়? গোহত্যাও তেমনি অধিকাংশ রাজ্যে নিষিদ্ধ এবং ভারতীয় হিন্দু সমাজে গোবধ একটি পাপকার্য বা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী মনে করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের ৪৮ (ক) ধারায় গোহত্যা নিষিদ্ধকরণের নির্দেশিকা রয়েছে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই আইন প্রণীত হলে সবরকম বিভ্রান্তি দূর হবে। যাঁদের গোমাংসের লালসা, তারা কি সমষ্টির ভাবাবেগকে মর্যাদা দিতে একটু লোভ সম্বরণ করতে পারেন না— গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটাইতো হওয়ার কথা।

*(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ আধিকারিক)*

# মুসলমান পুরোহিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি॥** সাম্প্রদায়িকতার বিষ মাঝেমধ্যেই দেশের আবহাওয়াকে ভারি করে তুলছে। রাজনীতিকদের একাংশ সেই বিষকে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে ছাড়ছেন না। এরই বিষময় ফলস্বরূপ মাঝেমধ্যেই দেখা যাচ্ছে হিন্দু-মুসলমান হানাহানি। রাজস্থানের বাগোরিয়া গ্রামে কিন্তু সেই সাম্প্রদায়িকতার আঁচড় লাগতে দেননি জামালুদ্দিন খান, যিনি এখানকার প্রাচীন দুর্গা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

মুসলমান হয়ে হিন্দু মন্দিরের পুরোহিত!— শুনে হয়তো অনেকেই আশ্চর্য হচ্ছেন। ঘটনা হল, প্রায় ৬০০ বছর ধরে বংশপরম্পরায় এই মুসলমান পরিবারটি প্রাচীন এই দুর্গামন্দিরের প্রধান পুরোহিতের আসন অলঙ্কৃত করে আসছেন। রাজস্থানের যোধপুরে বাগোরিয়া গ্রামের এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই প্রাচীন দুর্গামন্দির। এই মন্দিরের পুরোহিত মুসলমান হওয়ার নেপথ্যে রয়েছে এক অন্য কাহিনি। জানা যায়, তৎকালীন সিন্ধুপ্রদেশের (বর্তমানে পাকিস্তান) এক মুসলমান পরিবারের চারজন সদস্য ভারতের মধ্যভাগ অঞ্চলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। উটের পিঠে চড়ে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে আসার সময় তারা ক্লান্ত, ক্ষুধার্থ এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। সকলে মিলে ধু-ধু মরুভূমি প্রান্তরে বসে খানিক বিশ্রাম নিতে যান। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটানোর কোনো উপায় তাঁরা খুঁজে পাননি। এইভাবে একটাদিন কাটার পর প্রাণে বেঁচে থাকাই যেন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে তাঁদের কাছে। ঠিক সেই রাতেই মা দুর্গার স্বপ্ন পান পরিবারের এক সদস্য। এরপরই মরুভূমির মধ্যে এক কুয়োর সন্ধান পান তারা এবং কোনোরকমে তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হন। সেই কুয়ো থেকেই উদ্ধার হয় এই মন্দিরের বিগ্রহ। পরবর্তী সময়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন ভারতে বসবাস করার এবং সেইমতো বসবাসও শুরু করেন। বাগোরিয়া গ্রামের পাহাড়ের চূড়ায় নির্মাণ হয় এক সুবিশাল দুর্গামন্দির। সেই মন্দিরেই গত ৬০০ বছর ধরে খান পরিবারের কোনো না কোনো সদস্য প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব সামলে আসছেন।

গত ৫০ বছর ধরে জামালুদ্দিন খান এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্বে। এখানে সকল ধর্মের মানুষ বসবাস করেন। তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য লক্ষ্যণীয়। গ্রামের আট থেকে আশি সকলেই এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে মান্য করেন। আমাদের দেশে যখন বহু জায়গাতেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, হানাহানি হয়েছে তখনও এই গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের কোনো ঘাটতি ছিল না। আঁচ পড়েনি হিন্দু-মুসলমান প্রধান দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কে। খান পরিবার দুর্গার উপাসনা যেমন করে থাকেন তেমনই তাঁরা নিয়ম করে নামাজ পাঠও করেন। জামালুদ্দিনের কথায়, উপাসনা পদ্ধতি আলাদা হলেও ভগবান এবং আল্লা এক এবং অনন্য।

*দুর্গামন্দিরে পূজা করছেন পুরোহিত জামালুদ্দিন খান (পাগড়ি মাথায়)।*

কোনো মানুষেরই এই মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। সকল ধর্মের মানুষই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন বিনা বাধায়। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন জাগ্রত এই দেবীকে চাক্ষুষ করতে। আগ্রহ ভরে সাক্ষাত করে যান প্রধান পুরোহিত জামালুদ্দিন খানের সঙ্গেও। বর্তমানে জামালুদ্দিনের বয়স হওয়ায় তাঁর ছেলে মেহেরুদ্দিন খান মন্দিরের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। সেইমতো ১৪তম পুরুষ হিসাবে জামালুদ্দিনের পর তিনিই হবেন এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

অন্য রকম

এই জাগ্রত দুর্গা মা-র উপর অগাধ আস্থা এবং ভরসা গ্রামবাসীদের। হিন্দু- মুসলমান-খৃষ্টান প্রত্যেকেই মন্দিরে উপস্থিত হন। বিশেষ করে সকাল এবং সন্ধ্যায় যে প্রার্থনা এবং আরতি হয় সেইসময় মন্দিরে দর্শনার্থীর সংখ্যা থাকে চোখে পড়ার মতো। রাজ্যের বাইরের লোকের কাছেও এই প্রাচীন মন্দির রাজস্থানের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। এ প্রসঙ্গে মেহেরুদ্দিন খান বলেন, প্রতিদিন কয়েক হাজার দর্শনার্থী মায়ের মন্দির দর্শনে আসেন। সাক্ষাত হয় প্রধান পুরোহিতের সঙ্গেও। বয়োঃজনিত কারণে ৪০০ সিঁড়ি টপকে মন্দিরে যাওয়া সম্ভব নয় প্রধান পুরোহিতের, তাই তিনি মন্দিরের এক গৃহেই বাস করেন। রমজান মাসে প্রতিদিন যেমন রোজা রাখেন জামালুদ্দিন তেমনই নবরাত্রিতে ৯ দিন নিষ্ঠা সহকারে উপবাসও করেন।

গত কয়েক বছরে এই গ্রামের অনেক কিছুই বদলেছে কিন্তু বদলায়নি সেই কুয়োটা, যেখান থেকে ৬০০ বছর আগে দেবী দুর্গার বিগ্রহ উদ্ধার করা হয়েছিল। এই কুয়োর পবিত্র জল ব্যবহার করা হয় যে কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে। মন্দিরের পাশাপাশি এই কুয়োর পাশেই মসজিদ এবং মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে বাগোরিয়া গ্রামের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান থানারাম জাখাদ জানান, এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মুসলমান। আমরা ছোট থেকেই তাঁকে দেখে আসছি। মা দুর্গার আদেশ পাওয়ার পর থেকে এঁরা এখানেই মন্দির স্থাপন করেন বলে জানি। আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে তা মান্য করি। ■

## বেতাল পঞ্চবিংশতি থেকে

# একাগ্রতার অভাব

অনেকদিন আগে হেমকূট নামক রাজ্যে বিষ্ণুশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর এক ছেলে ছিল, নাম গুণাকর।

ছেলেটি জুয়া খেলার নেশায় তার বাবার জমানো সব টাকাকড়ি খরচ করে ফেলল। এরপর সে টাকার জন্য চুরি পর্যন্ত করতে শুরু করল।

বিষ্ণুশর্মা লজ্জা ও অপমানে তাঁর ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

গুণাকর অনেক দেশ ঘুরে এসে হাজির হলো এক শ্মশানে। সেখানে দেখল এক সন্ন্যাসী যোগাভ্যাস করছেন। গুণাকর সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সন্ন্যাসী বুঝলেন, ছেলেটি ক্ষুধার্ত। তাকে একটা মড়ার খুলিতে করে অনেক কিছু খেতে দিলেন। কিন্তু গুণাকর তা কিছুতেই খেতে রাজি হলো না। তখন সন্ন্যাসী যোগাসনে বসে চোখ বুঝলেন, সামনে এসে হাজির হলো এক যক্ষকন্যা। বলল— 'আদেশ করুন প্রভু।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'এই ব্রাহ্মণ খুবই ক্ষুধার্ত। আমার আশ্রমের অতিথি, এর খাওয়ার ব্যবস্থা কর।'

আদেশ পাওয়ামাত্র যক্ষকন্যার

মায়াবলে এক প্রাসাদ তৈরি হলো। সে ব্রাহ্মণকে সেই প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে খাওয়াল। তারপর তাকে মণিমুক্তা খচিত পালঙ্কে শুতে দিল। গুণাকরের সুখেই রাতটা কাটল। সকালে উঠে সে অবাক হয়ে গেল, দেখল সেসব কিছু নেই। তাহলে কি কাল রাতের সব ঘটনা স্বপ্ন ছিল? সন্ন্যাসীকে গিয়ে এই কথা সে জিজ্ঞেস করল।

সন্ন্যাসী বললেন— 'যক্ষকন্যা যোগবিদ্যার প্রভাবে এসেছিল। যে লোক যোগবিদ্যা জানে না, যক্ষকন্যা তার কাছে থাকে না।'

এই কথা শুনে গুণাকর সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরে বলল— প্রভু, আমাকে এই বিদ্যা শিখিয়ে দিন।

সন্ন্যাসী তার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন— 'চল্লিশ দিন মাঝরাতে গলা অবধি ঠাণ্ডা জলে ডুবে থেকে একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্রটি জপ করবে।'

গুণাকর সন্ন্যাসীর নির্দেশমতো জপ করে তাঁর কাছে এসে বলল— 'প্রভু, আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। এবার আদেশ করুন আর কি করতে হবে?'

সন্ন্যাসী বললেন— 'আরো চল্লিশ দিন জ্বলন্ত আগুনে দাঁড়িয়ে ওই মন্ত্র জপ করলেই তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে।'

গুণাকর বললো— 'প্রভু, অনেকদিন হলো গৃহত্যাগ করে এসেছি, বাবা-মাকে দেখতে বড়ই ইচ্ছা হচ্ছে। আগে বাবা-মাকে দেখে আসি, তারপর আপনার নির্দেশ মতো কাজ করব।'

সন্ন্যাসীর অনুমতি নিয়ে গুণাকর বাড়ি গেল। অনেকদিন পর ছেলেকে কাছে পেয়ে বাবা-মার আনন্দের সীমা নেই। মা আনন্দে কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা জানতে চাইলেন এতদিন সে কোথায় ছিল?

তখন গুণাকর সমস্ত কথা খুলে বলল, 'এক সন্ন্যাসীর কাছে আমি এখন মন্ত্রসাধনা করছি। তোমাদের দেখতেই এসেছিলাম, এবার আবার ফিরে যাব।'

শুনে মা বললেন, 'আমাদের এইভাবে দুঃখ দিয়ে তুই চলে যাস না, যোগাভ্যাস করবার বয়স এটা নয়। ঘরে থেকে সংসার করলেই যোগাভ্যাসের ফল পাবি। আমরা বৃদ্ধ হয়েছি, এখন আমাদের সেবা করাই তোর পরমধর্ম।'

গুণাকর শুনে একটু হেসে বললো, 'মায়াময় এই সংসার একেবারেই অসার। মায়া প্রপঞ্চময়, এ জগতে কেউ কারো নয়, সবই ভুল। এই মায়ায় আবদ্ধ থেকে আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না। যে পথকে বেছে নিয়েছি, তাকে ছাড়তে পারব না।'

মায়ের শত কান্নাও তাকে আটকাতে পারল না। বাবা-মাকে প্রণাম করে সে বাড়ি থেকে চলে গেল।

তারপর সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে জপ করল। কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। কারণ একাগ্রচিত্ত ও নিষ্ঠা না হলে কোনো কাজে ফল লাভ হয় না। যোগ সাধনায় একান্ত নিষ্ঠার প্রয়োজন, ব্রাহ্মণ কুমারের যদি তা থাকত তাহলে সাধনা ছেড়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রাণ চঞ্চল হোত না। তাই এত কষ্ট করেও সে সিদ্ধিলাভ করতে পারল না। ■

## মনীষী কথা

### সুভাষচন্দ্র বোস



ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস। দেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। গঠন করেছেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। যার মাধ্যমে উত্তরপূর্ব ভারতের কিছু অংশ ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত হয়। তিনি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপকে স্বাধীন করে তার নাম দেন শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা তাঁকে নেতাজী আখ্যায় ভূষিত করেন।

সুভাষচন্দ্রের জন্ম ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি। ওড়িশার কটক শহরে। ১৯১৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। তারপর উত্তীর্ণ হন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজদের অধীনে চাকরি করতে অসম্মত হন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে। জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবেও তিনি নির্বাচিত হন। দেশভক্তির জন্য দেশের মানুষের কাছে অমর হয়ে আছেন এই মহানায়ক।

## প্রশ্নবাণ

১.পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মন্ত্রী কে?

২.'টিনের তলোয়ার' নাটকটি কার রচনা?

৩.সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন-র বর্তমান চেয়ারম্যান কে?

৪.প্যারিস কোন্ দেশের রাজধানী?

৫.'গোলাপি শহর' কোন্ শহরকে বলা হয়?

উত্তর : ১. গৌতম দেব। ২. উৎপল দত্ত। ৩. প্রসূন জোশী। ৪. ফ্রান্স। ৫. জয়পুর।

## ছবিতে অমিল খোঁজ

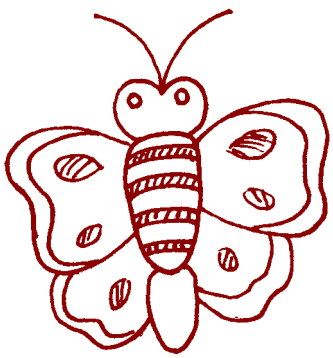

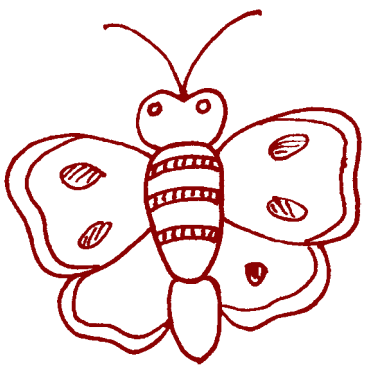



## শব্দের খেলা

*লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে*

(১) ক না শ ণ র

(২) বো অ ল ন কা

*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*

(১) ম কি র স্ক রা

(২) র অ ট স্কো ভা

**১১ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর**

(১) রাখালরাজা (২) বাণীবন্দনা

**১১ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর**

(১) মদনমোহন (২) অনিন্দ্যসুন্দর

**উত্তরদাতার নাম**

(১) দীপান্বিতা পাল, দৌলতপুর, দঃ দিনাজপুর, (২) সোহম চ্যাটার্জি, মকদুমপুর, মালদা, (৩) রাতুল ভট্টাচার্য, শিবপুর, হাওড়া, (৪) সৃঞ্জনা চ্যাটার্জি, সিউড়ী, বীরভূম

*সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।*

**উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়**

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

*ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।*

# মহিলাদের স্বপ্ন পূরণের পদক্ষেপ

**সুতপা বসাক ভড়**

গত বছরের স্বাধীনতা দিবসে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাকে একজন মহিলা সৈন্য আধিকারীকের নেতৃত্বে যখন গার্ড অফ্ অনার দেওয়া হয়েছিল, তখনই একজন নারী হিসাবে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করি। মহিলা সশক্তিকরণকে অন্যতম প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়ার পথে আমরা চলতে শুরু করেছি। বছরের শেষে মহিলাদের প্রতি অপরাধ করে বয়সের অজুহাতে ছাড় পেয়ে যেত এমন জঘন্য মানুষ— নাবালক হলেও সে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পাবেই— এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। বর্তমান কেন্দ্র সরকারের ওপর মহিলাদের আশা অনেক কারণে। এই সরকার মহিলা সশক্তিকরণের দাবি তুলে তার পক্ষে অনেক কাজ করেছে এবং করছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও— আমাদের জীবনে মেয়েদের গুরুত্ব বোঝাতে অনেকটাই সক্ষম আর আইনের পক্ষ থেকেও সুরক্ষা পাচ্ছে গর্ভস্থ কন্যাসন্তানটি। স্বচ্ছতা অভিযানের মাধ্যমে বাড়ি এবং বিদ্যালয়ে শৌচালয় নির্মাণ ও তার ব্যবহার মেয়েদের মধ্যে সম্মান ও আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে।

দেশে মহিলাদের শিক্ষা স্তরেরও উন্নতি হয়েছে। কিছু কিছু রাজ্যে তো মহিলা আর পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার তফাৎ মাত্র পাঁচ শতাংশ। সাংসদদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৬২-তে পৌঁছে গেছে। এঁদের মধ্যে ৪৪ শতাংশ মহিলা সাংসদের যোগ্যতা শিক্ষাগতভাবে স্নাতকোত্তর। পঞ্চায়েতে মহিলাদের মোট অংশীদারি ৪৬.৭ শতাংশ।

পড়াশুনার ক্ষেত্রে মেয়েদের একটা বড় বাধা ছিল বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচালয় না থাকা। এজন্য কৈশোরাবস্থায় পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই অনেক মেয়ে লেখাপড়া ছেড়ে বাড়িতে বসে যেত। বহুক্ষেত্রে বাড়িতে শৌচালয় না থাকায় অসুরক্ষা এবং লজ্জার শিকার মহিলারাই বেশি হোত। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে স্বচ্ছতা অভিযানের


*Swachchha Bharat  Swabolombee Bharat*

**How to build a nice home, think of us**

**WE PROVIDE :-**

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet)  + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin &  Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your  heated roof.

***Contact***

**ABC ENGINEERS & SERVICES**

**"PARK PLAZA"** Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com




মাধ্যমে শৌচালয় বানাবার এবং ব্যবহার করার আগ্রহ মহিলাদের মধ্যে স্বস্তি এনে দিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে শৌচালয় বানাবার জন্য আর্থিক ঘোষণার ফলে শৌচালয় নির্মাণ ও ব্যবহার আরও ব্যাপক হারে কার্যকর হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হরিয়ানা সরকারের পদক্ষেপ প্রশংসনীয়। হরিয়ানা সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন লড়ার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরের সঙ্গে বাড়িতে ব্যবহৃত শৌচালয় অনিবার্য করে দিয়েছে। বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলে, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে শিক্ষা এবং স্বচ্ছতা দু'টিই জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

সম্প্রতি বম্বে হাইকোর্ট মহিলাদের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার যে মৌলিক অধিকার আছে— তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহিলাদের জন্য আলাদা করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচালয় বানাবার জন্য মুম্বই নগর নিগমকে আদেশ দিয়েছেন। এই ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে সামান্য হলেও একজন মহিলার কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

মহিলাদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু অনেকেই ফেলেন, বড় বড় বক্তব্য রাখেন; মহিলাদের কী করণীয় সে ব্যাপারে মতামত জানাতেও এগিয়ে আসেন, কিন্তু মহিলাদের প্রাথমিক অসুবিধা কোথায়— তা জানার প্রয়োজন ওইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বোধ করেন না— তাঁরা তো আত্মতুষ্টিতে ভোগেন। ২০১৫ সাল— ভারতীয় মহিলাদের কাছে অনেকগুলি স্বপ্নপূরণের বছর। এই বছর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বেশ কিছু ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে আমাদের মহিলাদের অনেক আশা পূরণ হয়েছে। ভবিষ্যতেও বড় বড় ভাষণ নয়, বরং এইরকম ছোট ছোট পদক্ষেপ যা মহিলাদের জন্য খুবই কার্যকরী এবং যা সামাজিক, শারীরিক এবং মানসিক উন্নয়নমূলক তার সার্থক প্রয়োগের আশায় রইলাম। ■

# প্রাচীন প্রত্ন-ক্ষেত্র ও শৈবতীর্থ এক্তেশ্বর

**বিপ্লব বরাট**

বাঁকুড়া রাঢ় অঞ্চলের মধ্যমণি। সনাতন আর্য সভ্যতার প্রাচীন সংস্কৃতি ধারা ও জেলার স্থাপত্য-ভাস্কর্যে পুরাকীর্তিগুলির নিদর্শন রাঢ় সংস্কৃতির মৌল পরিচয় বহন করে চলেছে। জেলার আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজের মতো। এর উত্তরে বর্ধমান জেলা, এর দক্ষিণে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা, পূর্বে হুগলি ও পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলার অবস্থান। আয়তন ৬৮৮২ বর্গকিলোমিটার। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সদস্য। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ভি বল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়ার বিহারীনাথ পাহাড়ের ১১ মাইল দূরবর্তী গোপীনাথপুর গ্রাম থেকে প্রস্তরযুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার করে ও সেগুলি পরীক্ষা করে এই অঞ্চলের সভ্যতাকে 'হরপ্পা পূর্ব সভ্যতা' বলে অভিহিত করেন। শুশুনিয়া পাহাড়ের রাজা চন্দ্রবর্মার বিখ্যাত শিলালিপিটি দেখে একথা প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ব থেকেই সনাতন হিন্দু উপাসনার কেন্দ্র ছিল এই বাঁকুড়া জেলা। বর্তমানে সেই সনাতন উপাসনার ধারা বিরাজমান প্রাচীন শৈবতীর্থ এক্তেশ্বরে। বাঁকুড়া শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে, পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রাচীন মন্দিরগুলির অন্যতম এক্তেশ্বরের বিখ্যাত শিব মন্দিরটি অবস্থিত।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে : ''বেদে এক পাদেশ্বরের উল্লেখ আছে। যে নামটি অপভ্রংশে এক্তেশ্বরে এসে দাঁড়িয়েছে। কুণ্ডের মধ্যে শিব লিঙ্গটি নাকি দেখতে অনেকটা মানুষের পায়ের মতো।''[১] জনশ্রুতি আছে বিষ্ণুপুরের মল্লভূমের রাজার সঙ্গে ছাতনার সামন্তভূমের রাজার রাজ্য সীমানা নিয়ে বিবাদ হলে তার মীমাংসা করেন স্বয়ং শিবশম্ভু, দুই সীমানার সংযোগস্থলে একতার প্রতীক হিসাবে এই এক্তেশ্বর মন্দির স্থাপিত হয়। (একতা+ইশ্বর)

বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে 'এক্তেশ্বর মন্দিরের শায়িত শিবলিঙ্গ বাঁকাভাবে অবস্থিত হওয়ায় এ স্থানের নাম বাঁকুড়া'[২] (মৌজার নাম ভূতেশ্বর, জে এল নং ২০৮)। বিদ্যানিধি মহাশয়ের অন্য মতে 'বামকুণ্ড (বামদিকের ঝরণা বা জলধারা) শব্দের অপভ্রংশ বাঁকুড়া।'[৩] কিন্তু বাঁকুড়া মৌজার এমন কোনো ঝরণা বা জলধারের প্রাচীন অস্তিত্বের নিদর্শন নেই। এক্তেশ্বরে পাথরের শিব মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট, এটি পশ্চিমমুখী। ল্যাটারাইট প্রস্তর দ্বারা সুন্দর ও সুগঠিত।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া রিপোর্টের অষ্টম খণ্ডে মিঃ জে. ডি. বেগলার লিখেছেন— এক্তেশ্বরের মন্দিরটি অন্তত তিনবার সংস্কার হয়েছে। মন্দির শিখর ভেঙে পড়ে ছিল তার পুনর্নির্মাণের সময় উচ্চতা হ্রাস পেয়েছে।

অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই মন্দিরটি আদিতে একটি এক সুউচ্চ শিখর-দেউল ছিল। 'প্রাঙ্গণে ছোট ছোট

*এক্তেশ্বর বিগ্রহ*

উপমন্দিরের মধ্যে, এক ভগ্ন বাসুদেবমূর্তির নিম্নাংশ; চার ফুট উচ্চতা ও আড়াই ফুট প্রস্থের এক দ্বাদশভুজ লোকেশ্বর-বিষ্ণু; সাড়ে তিন ফুট উচ্চতা ও পৌনে দু' ফুট (১.৭৫ ফুট) প্রস্থের আছে। এক গণেশও ২.৭ ফুট উচ্চতা এবং ৩ ফুট দৈর্ঘ্যে অবস্থিত আছে ও একটি নন্দী বৃষের মূর্তি আছে। সব কটিই পাথরের এবং খুব সুন্দর। অনুমান হয় আদিতে এ বিগ্রহগুলি সাবেক মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে অধুনা-শূন্য কুলঙ্গিগুলিতে রক্ষিত ছিল।'[৪] জৈনদের ধর্মগ্রন্থ আচারঙ্গ সূত্রে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে মহাবীরের রাঢ় পরিভ্রমণের উল্লেখ আছে।

বাঁকুড়া জেলার অদূরবর্তী পরেশনাথ পাহাড় ছিল জৈন সাধকদের সাধনপীঠ 'সমেৎ শিখর'। জৈন তীর্থংকরেরা ওই সমেত শিখর থেকে নেমে এসে রাঢ় অঞ্চলে প্রবেশ করতেন দামোদর, দ্বারকেশ্বর, কংসাবতী, শিলাবতী প্রভৃতি নদীপথে। বহুলাড়া, ধরাপট ও এই অঞ্চলের এক্তেশ্বরে জীবনধারায় জৈন রীতির সংমিশ্রণ ঘটে। এমনকি জৈন শ্রমণগণ এখানে স্থানীয় শৈব ভাবনায় নিজেদের সম্মিলিত করেন। (১১.৪.২০১২)। শৈবতীর্থ এক্তেশ্বরের ক্ষেত্র সমীক্ষায় অপ্রকাশিত পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল। মন্দির প্রাঙ্গণে খোলা আকাশের নীচে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে মাটির বেদীতে মাটির হাতি গোড়ার সঙ্গে দু'টি পাথরের পা ও প্রত্নবস্তুগুলি অবহেলায় পড়ে আছে যা চুরি বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি ২ ফুট চণ্ডী নামে পূজিত পাথরের মূর্তি দেখা যায়।

পুরাস্থলের স্থাপত্য রীতি পর্যবেক্ষণ করে বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শনাদি চিহ্ন পাওয়া যায়। এক্তেশ্বরে দ্বাদশভূজ লোকেশ্বর বিষ্ণু মূর্তিটি লৌকিকদেবী মনসা ও খাঁদারানী নামে পূজা পাচ্ছেন। দেবীর ডান পায়ে সামান্য ফাটল লক্ষ্য করা যায়। এই প্রত্নসূচিগুলি গৌরবের স্মারক। এটি যত্নসহকারে রাখা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। সোমবারে দর্শনার্থী পর্যাপ্ত হলেও প্রতিদিনই নিত্য পূজা হয়। পৌষসংক্রান্তিতে, শিবচতুর্দশী, চৈত্রের গাজনে উৎসব হয়। এসব মেলার একদিকে ভক্তরা হোত্তা দেওয়া প্রথা, দণ্ডী কেটে সারা পথ পরিক্রমা করে। অন্যদিকে চলে ভক্তমণ্ডলীর 'বানফোঁড়া' আগুন সন্ন্যাসীর কুচ্ছ্রসাধনা। সাধারণ মানুষের সব কামনা পূর্ণ করেন শিববাবা ও রোগ, শোক থেকে রক্ষা করেন এই প্রচলিত ধারণা ও শাশ্বত বিশ্বাস। গাজনকে কেন্দ্র করে চৈত্র সংক্রান্তির দিন একেশ্বরে হয় শিবের পূর্ণ উৎসব ও মেলা। স্বদেশ ও বিদেশ থেকে আগত হাজার হাজার দর্শকমণ্ডলীর সমাগমেও একই সঙ্গে বাউল গান, রামায়ণ গান শোনা যায়। লৌকিক সাংস্কৃতিক ও সনাতন ধর্মীয় ভাবধারার ত্রিবেণী সঙ্গমে এক্তেশ্বরের মেলা হয়ে উঠে আকর্ষণীয়ও গুরুত্বপূর্ণ।

**তথ্যসূত্র :**

১. প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪৯ সালে 'ফাল্গুন সংখ্যা'— আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়।

২. তদেব।

৩. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি— বিনয় ঘোষ।

৪. বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি— অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. ক্ষেত্রসমিক্ষা ও নিদর্শন সাহিত্য পত্রিকা— সম্পাদনা— বিপ্লব বরাট।


## যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

# প্রেরণার পাথেয়

'প্রথমে বিচার করিয়া দেখা দরকার যে রাষ্ট্র শব্দের অর্থ কী? কোনো ঘন জঙ্গল, জলহীন মরুভূমি কিংবা কোনো নির্জন ভূভাগকে রাষ্ট্র বলে না। যে ভূভাগে এক বিশিষ্ট জাতির, বিশিষ্ট ধর্মের, বিশিষ্ট পরম্পরা-সম্পন্ন ও বিশিষ্ট চিন্তাধারার লোক বাস করে সেই ভূভাগকেই রাষ্ট্র বলে। তাহাদের নামেই সেই রাষ্ট্রের নাম হয়। এইরূপ লোকেদের হিতাহিত কল্পনা এক হওয়ার ফলে তাহাদের মধ্যে এক বিশিষ্ট প্রকারের একাত্মর সৃষ্টি হয়। যাহাদের সংস্কৃতি আলাদা, চিন্তাধারা আলাদা, ইতিহাস আলাদা, কী ভাল কী মন্দ সেই সম্বন্ধে যাহাদের মনে পরস্পর-বিরোধী কল্পনা আছে, যাহারা পরস্পরকে শত্রু বলিয়া মনে করে, যাহাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ভক্ষ্য ও ভক্ষকের ন্যায় এবং যাহাদের একত্রিত থাকার কারণও এক নয়, সেইরূপ লোকের সমষ্টি মাত্রকে রাষ্ট্র নাম দেওয়া চলে না।'

*(সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের বাণী থেকে)*

'জাতীয় শিক্ষাকে তাই, পরিচিত প্রাচীন উপাদান সহায়েই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অতীতের গৌরবময় আদর্শকেই উপস্থাপিত করতে হবে শিক্ষার আদর্শরূপে। বীরভাবব্যঞ্জক সাহিত্যের উপর সংস্থাপিত হবে কল্পনার ভিত্তি। স্বদেশের ইতিহাস অবলম্বন করেই রূপ পরিগ্রহ করবে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা।'

*— ভগিনী নিবেদিতা*

**সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী**

# বড় ধরনের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে আসন্ন বাজেটের কয়েকটি দিকনির্দেশ

অতিথি কলম

এন ডি কৃষ্ণকুমার

এটা মানতে কোনো দ্বিধা নেই যে, রাজনীতিবিদরা সবসময়ই অন্য পেশার লোকের থেকে সাধারণ মানুষের মনের হদিশ অনেক আগেই পেয়ে থাকেন। যাকে বলে নাড়ীজ্ঞান। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বেশ ভালই বুঝতে পারছেন, ক্ষমতায় আসার ১৮ মাস পরে মানুষের সরকারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতে বেশ পরিবর্তন এসেছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই জনগণের বিপুল আশা ও সম্ভাব্য সুযোগের প্রত্যাশার জায়গাটা অনেকটাই অধিকার করেছে হতাশা ও উদাসীনতার ভাব। মানুষের মধ্যে সরকার সম্পর্কে যেমন একটা নির্ভরশীলতা হারানোর অনুভূতি মাথাচাড়া দিচ্ছে, বস্তুত সরকারের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে চলতি অবস্থা বদলানোর যে প্রতিশ্রুতি ছিল তার রূপায়ণের ঘাটতিই এর কারণ বলে মনে হয়।

> “আসন্ন বাজেটে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্ফোরণই তাকে উন্নয়নের গতিপথে ফিরিয়ে আনতে পারে। বন্ধ হতে পারে কলরব করা বিরোধীদের মুখ। দেশ উন্নয়ন নিয়ে আবার নতুন স্বপ্ন দেখা শুরু করতে পারে।”

দুঃখের কথা, এই বাতাবরণটিই চাইছিলেন তথাকথিত বাম বুদ্ধিজীবীরা ও তাদের লেজুড়শ্রেণী। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে মানুষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার ক্ষেত্রে সরকারের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত জনসংযোগ পদ্ধতি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আনার রাস্তাগুলি পরিষ্কার করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও আম-জনতার কাছে তা বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়নি। কেননা, বাস্তবে তার প্রতিফলন সেভাবে তারা দেখতে পাচ্ছেন না। আর এগুলির মধ্যে যে যুক্তি রয়েছে তার প্রমাণ অর্থমন্ত্রীর পেশ করা বিগত দু'টি গতানুগতিক বাজেট। যার মধ্যে যতটা না অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দিশা ছিল, তার থেকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রয়াস ছিল বেশি।

অর্থমন্ত্রী আবার জনমনে হতাশা কাটিয়ে উদ্দীপনার পরিবেশ ফেরাতে পারেন, যদি তিনি কতকগুলি বিষয়কে বিবেচনা করে একটি যথার্থ আশাব্যঞ্জক বাজেট দিতে পারেন, যা ২০১৪ সালের জনতার ভোটের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মানানসই হতে পারে। এ বিষয়ে ছ'টি দিক একটু নজরে আনতে চাই—

**(১) সাধারণ মানুষের জন্য ব্যাঙ্কিং—**

আমরা জানি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সোনা কিনে রাখার প্রবণতা আছে। তেমনি গরিব-গুর্বো মানুষ অনেকেই টাকা বাড়িতে জমা রাখেন। এই বিপুল ব্যাঙ্ক এড়িয়ে যাওয়া শ্রেণীর টাকাকে ব্যাঙ্কের তহবিলে ঢোকাতে পারলে ঋণযোগ্য অর্থের পরিমাণ অনেকটাই বাড়তে পারে। অসংগঠিত শ্রমিকদের গরিষ্ঠাংশই নগদে তাদের রোজগারের টাকা পায়। তারা এই টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে সরকারের তরফে 'Earned Income Tax Credit' যা আদতে তাদের ব্যাঙ্কের পাশবই মারফত জমা টাকার প্রমাণ দেখালেই সরকারের তরফে কিছুটা উৎসাহ-ভাতা। যে অর্থ তাদের সেভিংস খাতায় পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এতে গরিষ্ঠাংশ বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মী, শ্রমিক তাদের টাকা ব্যাঙ্কে রাখতে উৎসাহ পাবে। সরকারের কাছে বছরে একবার ব্যাঙ্কের হিসেব দাখিল করলেই নিয়মমাফিক উৎসাহভাতা অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে যাবে।

**(২) গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড়সড় টাকার বিনিয়োগ—**

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রুরাল মিশন (এস পি এম আর এম) গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক-অর্থনৈতিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে একটি দারুণ প্রচেষ্টা। কিন্তু দুঃখের কথা, এই প্রকল্পে বাজেটে মাত্র পাঁচ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রাখা, প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা। একেবারে গ্রামীণ স্তরে গিয়ে বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়নই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। তাই রাজ্য সরকারগুলি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে তাদের এলাকার প্রয়োজনভিত্তিক প্রকল্প তৈরি করে কাজ করতে বলতে হবে। যথার্থ

'পঞ্চায়েতি রাজ' প্রতিষ্ঠা হলে তারাই নিত্য নতুন উন্নয়নের পরিসর খুঁজে বার করবে।

**(৩) জুয়াকে আইনসিদ্ধ করা**—

সকলেই জানেন আজকের ওয়ান ডে, আই পি এল ইত্যাদি খেলা নিয়ে দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থাগুলোতে ডামাডোল ঘটে চলেছে। এটাকে জঘন্য পরিস্থিতি বললে কম বলা হয়। এর মূল কারণ খেলা নিয়ে জুয়া। বুঝে নেওয়া দরকার, দেশব্যাপী এই জুয়ার প্রকোপ কিন্তু মোটেই বন্ধ হওয়ার নয়। এটি দেশে দিনকে দিন স্থায়ী হয়ে বসছে। এবার ফুটবল লিগও পুরোদমে শুরু হয়েছে ও জনপ্রিয়ও হয়েছে। এই দু'টি খেলাই পেশাগতভাবে লিগভিত্তিক হওয়ায় দেশব্যাপী এর অনুরাগী সমর্থকরা ছড়িয়ে রয়েছেন। তারা প্রিয় দলের পেছনে বাজি ধরতেই পারেন। আর বাজি ধরার জায়গা? দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বহু স্বীকৃত ক্লাব যেখানে তাস ইত্যাদি খেলা হয়, নানা বড় ও ছোট শহরে ছড়িয়ে রয়েছে। এইগুলিকেই বাজি ধরার ছোটখাটো এক্সচেঞ্জ বা কাউন্টার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সরকার বাজি ধরাকে স্বীকৃতি দিলে এদের গায়ে কোনো কালি লাগার আশঙ্কা থাকবে না। খেলায় বাজি ধরা বহু দেশেই স্বীকৃত। দেশে এই ক্ষেত্র থেকে অনায়াসে সরকার বছরে কুড়ি হাজার কোটি টাকার মতো আয় নিশ্চিত করতে পারে। কেননা, দেশব্যাপী বেটিং-এর অঙ্ক বহু লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়।

**(৪) শূন্য ধরে বাজেট তৈরি করা**—

ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বললে দাঁড়ায় প্রত্যেক দপ্তরে এযাবৎ যে খরচ বরাদ্দ হয়ে আসছে তা মঞ্জুর হবে ধরে নিয়েই আরও থোক বেশি কিছু অর্থ বাজেটে বরাদ্দ যে হবেই এটাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু সরকারের ঘোষিত 'minimum goverment maximum governance' নীতির সঙ্গে এটা খাপ খায় না। বাধ্যতামূলক খরচ বরাদ্দ করতেই হবে-এই ধারণাকে মান্যতা দিতে গিয়ে ও বাড়তি টাকা বরাদ্দ করার কারণে প্রতিবছর বিপুল ঋণ করতে হয়। আমলাতন্ত্র এই গতানুগতিক রীতি খুব পছন্দ করে, কারণ এই সরল পন্থায় নির্দিষ্ট প্রকল্প বা উন্নয়নভিত্তিক কোনো কাজের উল্লেখ থাকে না। সবটাই একটা থোক হিসেব। ধারাবাহিক খরচ চলছে তার যথাযথ বিচার করে আগেই কোনো নির্দিষ্ট খরচ চিহ্নিত না করে শূন্য থেকে শুরু করলে বিভিন্ন মন্ত্রীরাও তাঁদের দপ্তরে টাকা আসা নিয়ে কখনোই নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারবেন না। ফলে তাঁদের অবশ্যই সঠিক পূর্বপরিকল্পনা ভিত্তিক যথার্থ ফলদায়ী প্রকল্পগুলিকেই বাছতে হবে। ফলে সরকারি টাকা সঠিক জায়গাতেই নিয়োজিত হবে।

অন্যদিক দিয়ে বছরের শেষে বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্প অনুযায়ী কাজের যুক্তিযুক্ততা ও যথাযথ রূপায়ণভিত্তিক মূল্যায়ন করাও সহজ হবে।

**(৫) কৃষিভিত্তিক আয় করের আওতাভুক্ত হোক**—

বিভিন্ন সময়ের নানান সরকার বরাবরই এবিষয়ে বহু কমিশন গঠন করেছে, যারা কৃষি সংক্রান্ত আয়কে করভুক্ত করার পক্ষেই মত দিয়েছে। কৃষকরা মধ্যসত্ত্বভোগীদের খপ্পর থেকে বেরোতে পারলেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের বছরগুলি ছাড়া একটা স্থিতিশীল আয়ের অবস্থাতেই থাকেন। বছরের পর বছর ধরে ধনী কৃষকরা আয়কর ছাড়ের সুবিধা ভোগ করে আসছেন। শুধু তাই নয়, বহু ক্ষেত্রেই অকৃষি ক্ষেত্রের আয়কে পর্যন্ত কর ছাড়ের সুযোগ নিতে কৃষিজনিত আয় বলে চালানোর চেষ্টা হয়। তাই আর দেরি না করে করের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করতে এখনই অর্থমন্ত্রীর উচিত কৃষিক্ষেত্রের আয়কে আয়করের আওতায় নিয়ে আসা। এই সাহসী সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সরকার কৃষি আয়ের উর্ধ্বসীমা দরকার পড়লে একটু উদারভাবে বাড়িয়ে রাখতে পারেন বা ল্যাণ্ড হোল্ডিং-এর ক্ষেত্রে জমির নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়ানোর কথা বিবেচনা করতে পারেন।

**(৬) নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার বাহক হতে পারে এমন পন্থা** (Special Purpose Vehicle SPV)---

সরকারের যে আশু লক্ষ্য রোজগার তৈরি, চাকরি সৃষ্টি— সেই পথে সবচেয়ে কার্যকরী হতে পারে দু'টি বিশেষ সরকারি প্রকল্প। (১) বিভিন্ন নদী সংযোগকরণ, (২) বুলেট ট্রেন চালু করা। এই প্রকল্প দু'টি সফল করতেই দরকার এস পি ভি তৈরি। এই ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রীকে সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারি ক্ষেত্রের কোল ইন্ডিয়া, এনটিপিসি, পাওয়ার গ্রিড ও ভেল-এই চারটি কোম্পানিতে সরকারের যে অংশীদারি আছে তা এই নতুন এস পি ভি-কে হস্তান্তর করে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই এস পি ভি-গুলির মাথায় অত্যন্ত বিশিষ্ট ও নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করতে হবে। সরকারের তরফে এঁদের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে, যাতে তাঁরা সরকারের তরফে হস্তান্তরিত হওয়ার আগে বলা চারটি সংস্থার শেয়ারের অন্তত ২০ শতাংশ করে বছরে শেয়ার বাজারে বিক্রি করে এস পি ভি-গুলির মূলধনের ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারেন। নিশ্চিত করে বলা যায়, এই পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারলে সরকারের 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' বা 'ন্যূনতম সরকার অধিকতম সুশাসন' (পি এস ভি কোম্পানিগুলি সরকার নিজের হাতে না রেখে হস্তান্তরিত করা)-এর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। অন্যদিকে বার্ষিক রাজস্ব ঘাটতি সামাল দিতে অর্থবর্ষের শেষে সরকারি সংস্থাগুলির শেয়ার বিক্রির অন্যায্য নির্ভরতাও বন্ধ হবে।

বিগত ১৮ মাসে খনি নিলাম, স্পেকট্রাম নিলাম (আবার একটি সর্বকালীন রেকর্ড অঙ্কের দু-হাজার মেগাওয়াটের ৭টি ব্যান্ডের নিলাম হতে চলেছে এর আগের নিলামে অভূতপূর্ব ১.১ লক্ষ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে) এর সফলতা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই সরকার তার লক্ষ্যের থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আসন্ন বাজেটে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর বিস্ফোরণই তাকে উন্নয়নের গতিপথে ফিরিয়ে আনতে পারে। বন্ধ হতে পারে কলরব করা বিরোধীদের মুখ। দেশ উন্নয়ন নিয়ে আবার নতুন স্বপ্ন দেখা শুরু করতে পারে। সঙ্গে দু'অঙ্কের জিডিপি বৃদ্ধির সম্ভাবনা অসম্ভব ঠেকবে না। আর এই চমৎকার যে ২০১৯ সালের নির্বাচনকে সরকারের পুনঃনির্বাচনের দাবিদার করবে তা বলে দিতে হবে না। ▮

# লোকসংগঠনের প্রাচীন পরম্পরার পুনরুজ্জীবন ঘটছে

**প্রবাল চক্রবর্তী**

আসুন, একটা এক্সপেরিমেন্ট করা যাক। সত্যিই যে করতে হবে, এমন কোনো মানে নেই। কল্পনায় করে নিলেই হলো। একটা শিম্পাঞ্জিকে নেওয়া যাক। বেশ শক্তসমর্থ, নীরোগ। একটা মানুষকেও নেওয়া যাক। শক্তসমর্থ, নীরোগ। দু'জনকে একসঙ্গে একটা জনবিরল দ্বীপে ছেড়ে দেওয়া যাক। সে দ্বীপের পাড় ধরে আছে কয়েকটা ভীষণ উঁচু নারকেল গাছ, সে গাছে চড়া অতীব দুঃসাধ্য কাজ। দ্বীপের মাঝখানে আছে ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল। সে জঙ্গলে ঝরণা আছে, গাছে গাছে ফল ফলে আছে অঢেল। কিন্তু জঙ্গল দাপিয়ে বেড়ায় দাঁতাল বন্য বরাহের দল। তাদের এড়িয়ে মাটিতে হেঁটে জল বা ফল, কোনোটাই আহরণ করা সম্ভব নয়। কি মনে হয়, এই পরিস্থিতিতে শিম্পাঞ্জি না মানুষ, কে বেঁচে থাকবে? শিম্পাঞ্জির শারীরিক সক্ষমতা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। মানুষের চেয়ে ঢের বেশি ভালো গাছে চড়তে পারে সে। প্রথমেই সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গাছে চড়ে যাবতীয় খাবার হস্তগত করবে। মারামারি করে লাভ নেই, শিম্পাঞ্জির গায়ের জোর মানুষের থেকে অনেক বেশি। এই পরিস্থিতিতে বেঘোরে মারা পড়বে মানবসন্তান। বস্তুত, একটা শিম্পাঞ্জি আর একটা মানুষের যদি তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাবে, শিম্পাঞ্জি সর্বাংশে মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ। তবে কীভাবে মানুষ সব প্রাণীকে পেছনে ফেলে এতটা এগিয়ে গেল? মানুষ আর শিম্পাঞ্জির জিনগত সাদৃশ্য শতকরা নিরানব্বই শতাংশ। মাত্র এক শতাংশ ভিন্ন বংশানুর মধ্যে কী এমন রহস্য লুকিয়ে আছে, যার জোরে মানুষ এ ধরাধামের মোড়ল হয়ে বসেছে? সেটা জানার জন্য আরেকটা পরীক্ষা করতে হবে।

সেই একই দ্বীপে এবার একশ'টি মানুষ আর একশ'টি শিম্পাঞ্জি ছেড়ে দেওয়া যাক। দেখবেন, সেই মানুষদের কয়েকজন মিলে একটা মস্ত কাঠের গুঁড়ি সংগ্রহ করে সেটা ধরাধরি করে তুলে 'হেঁইও মারি' করে নারকেল গাছে ধাক্কা মারছে। ঝাঁকুনির চোটে নারকেলের সঙ্গে গাছে চড়া শিম্পাঞ্জিরাও টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে গাছ থেকে। কয়েকজন মানুষ আবার অস্ত্রশস্ত্র বানিয়ে ফেলেছে। জঙ্গল কেটে পথ বানিয়েছে। দল বেঁধে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ফলমূল পেড়ে আনছে, ঝরনার জল সংগ্রহ করছে, বন্য বরাহও শিকার করে ফেলেছে দু'একটা। কয়েকদিন যেতে না যেতে দেখা গেল, মানুষরা সমুদ্রের পাড়ে বেশ মজবুত একটা দুর্গ বানিয়ে ফেলেছে, শিম্পাঞ্জি আর বরাহের যুথ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য। শিম্পাঞ্জির দল ভয়ে পালিয়েছে জঙ্গলের গভীরে।

মানুষের শিং নেই, নখ নেই, দাঁত নেই। বাঁদরের মতো গাছে চড়তে পারে না, ঘোড়ার মতো দৌড়োতে পারে না, বাঘ-সিংহের মতো শিকার ধরতে পারে না। কিন্তু মানুষ এ পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী জীব। কারণ? একটা শিম্পাঞ্জি একটা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু এক লক্ষ শিম্পাঞ্জি শুধু নিজেদের মধ্যে গোলমাল আর মারামারি করবে, এক লক্ষ মানুষের সংগঠিত সমাজের সামনে দাঁড়াতেও পারবে না। মানুষ সংগঠন তৈরি করতে পারে, সেটাই মানুষের শক্তির রহস্য। তার মানে কি, একমাত্র মানুষই সংগঠন তৈরি করতে পারে? সেটা তো ঠিক নয়। শিম্পাঞ্জি বা গরিলা, পিঁপড়ে বা মৌমাছিও সংগঠন তৈরি করতে পারে। কিন্তু এদের সংগঠন- শক্তি সীমিত। শিম্পাঞ্জি বা গরিলার সংগঠন দশ-কুড়িটি প্রাণীর এক বৃহত্তর পরিবারেই সীমাবদ্ধ। এর চেয়ে বড় সংগঠন তারা তৈরি করতে পারে না। তাই কঙ্গোর জঙ্গলে গরিলাদের বাসভূমি যখন মানুষরা দখল করে নেয় খনিজ 'কোলট্যান'-এর লোভে, তখন কঙ্গোর সব গরিলা একত্রিত হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারে না। মানুষ কিন্তু সেটা পারে। যাদের সঙ্গে সরাসরি কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই, তাদের সঙ্গেও মিলেমিশে কোটি-কোটির সংখ্যায় সংগঠিত হতে পারে মানুষ। একটা 'কমন' উদ্দেশ্যের সিদ্ধিতে সেই সংগঠনকে পরিচালিতও করতে পারে।

মৌমাছি, পিঁপড়ে বা ভীমরুলদেরও এই ক্ষমতা রয়েছে। তারাও পারে কোটির সংখ্যায় মিলেমিশে একটা সংগঠন তৈরি করতে, সংগঠনের প্রয়োজনে আত্মাহুতি দিতে। একটা ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়লেই তা টের পাওয়া যায়। কিন্তু ভীমরুল বা পিঁপড়ের সমাজ স্থবির। সমাজের প্রয়োজনে সমাজ-সংগঠনকে বদলাতে পারে না তারা। মৌমাছি তাদের মৌমাছি রানিকে হটিয়ে মৌমাছি গণতন্ত্রের সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ তা পারে। পরিবর্তনশীল বৃহৎ সংগঠন সৃষ্টি, দশের স্বার্থে সেই সংগঠনকে চালিত করা, তাৎক্ষণিক ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে সংগঠনের প্রয়োজনে আত্মত্যাগ, মানুষের শক্তির উৎস এখানেই। এতেই লুকিয়ে আছে মানব-সভ্যতার অগ্রগতির রহস্য। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রতিটি শক্তিশালী জাতির অভ্যুত্থানের পেছনেই নিহিত আছে কোনো না কোনো সংগঠনের কাহিনি।

***

অস্ট্রেলিয়ার এই মেলবোর্নে এককালে রাজত্ব করত উরুন্দজেরি নামক এক উপজাতি। তারাই এই অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসী, চল্লিশ হাজার বছরের পুরোনো তাদের সভ্যতা।

তাদের ভাষা, বিজ্ঞান, দর্শন, উপাসনা পদ্ধতি— সবই রয়েছে। কিন্তু মেলবোর্ন বলতে আজ আর কেউ উরুন্দজেরিদের মনে করে না। এদেশের সভ্যতা মানে ইংরেজ সভ্যতা। উরুন্দজেরি আর অন্যান্য অ্যাবরিজিনালরা এখন এদেশের প্রান্তিক সভ্যতা। শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, সারা পৃথিবী

জুড়েই অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতা প্রান্তিক সভ্যতায় পর্যবসিত হয়েছে বা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অসুর-সভ্যতা এককালে মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়েছিল। অসুর বাণীপালের নামে কাঁপতো ধরাধাম। হালে আইসিসের অত্যাচারে অসুরদের শেষ বংশধররাও বিতাড়িত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এককালে মিশরের ফারাও-রা আকাশছোঁয়া পিরামিড বানিয়েছিল। আজ ফারওদের নামে জয়ধ্বনি দেবার কেউ নেই মিশরে। পারস্য সম্রাট দারিয়ুসের সামনে ইউরোপ-আফ্রিকার তাবৎ রাজশক্তি নতজানু হয়েছিল। আজ কে নেয় তাঁর নাম? আজটেক আর মায়া সভ্যতা তো বেমালুম উবেই গেছে।

অথচ ভারতীয় সমাজ আজও জীবিত।

পঁচাত্তর হাজার বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের 'টোবা' নামক এক জায়গায় অতিকায় এক আগ্নেয়গিরি হঠাৎ করেই জেগে উঠেছিল। তার অতি-অগ্ন্যুৎপাতে গোটা পৃথিবী জুড়ে মানবসভ্যতা হয়েছিল প্রায় বিলুপ্ত। পুরু ছাইতে ঢেকে গিয়েছিল বায়ুমণ্ডল। ধরিত্রীর সর্বত্র মানবসন্তানেরা সেদিন বহ্নিগ্রস্ত পতঙ্গের মতো পাইকারি হারে খুন হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের কর্নুল জেলার জ্বালাপুরমে পাওয়া গেছে দেড় লক্ষ বছরের পুরনো মানব-সভ্যতার নিদর্শন । ওই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় খননকার্য চালিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা জানতে পেরেছেন, টোবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সারা পৃথিবীর মতো ওই অঞ্চলও ঢেকে গিয়েছিল পুরু ছাইয়ের আস্তরণে। তবু মানবসভ্যতা সেখানে ধ্বংস হয়ে যায়নি। সভ্যতার যে স্রোত জ্বালা পুরমেটো বা অগ্ন্যুৎপাতের আগে বহমানা ছিল, অগ্ন্যুৎপাতের পরেও সেই সভ্যতা একইভাবে এগিয়ে চলেছিল উৎকর্ষের অভিমুখে। আধুনিক ভারত সেই নিরবচ্ছিন্ন বহমানা সভ্যতারই উত্তরসূরী।

কোন ইন্দ্রজালে ভারতের মানুষ সেদিন প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা থেকে রক্ষা পেয়েছিল? কোন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে একটি সভ্যতা লক্ষাধিক বছর জীবিত থাকে? সেই কোনো কালাতীত কালে দুর্গা নামক এক গণনেত্রী মহিষাসুর নামের এক স্বৈরাচারীকে যুদ্ধে হারিয়েছিলেন, আজও প্রতি বছর শরৎকালে আমরা সেই ঘটনাকে স্মরণ করি। সংস্কৃতির এই অমরত্বের রহস্য কোথায় লুকিয়ে আছে?

ভারতের ইতিহাসে যখনি দুঃসময় এসেছে, এদেশের কিছু দামাল ছেলেমেয়ে প্রতিকার করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এরা সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়ে, স্বেচ্ছাসেবী এরা। কিছু নিতে নয়, যুগে যুগে এরা শুধু দিতেই এসেছে। এরা ভারতের চিরজাগ্রত আত্মা। মা দুর্গার আহ্বানে এরা আসুরিক শক্তিকে ভারতবর্ষ থেকে নির্মূল করেছিল, চাণক্যের আহ্বানে এরাই আলেকজান্ডারকে ভারত থেকে তাড়িয়েছিল। বুদ্ধের আহ্বানে সেই আত্মাই বৌদ্ধ সঙ্ঘের রূপ নিয়েছিল, সেই আত্মাই আবার শঙ্করের আহ্বানে দশনামী সম্প্রদায় হয়েছিল। শিখ খালাসা থেকে শিবাজীর মওয়ালী, ইংরেজ-সাম্রাজ্যের হাড়-কাঁপানো অনুশীলন সমিতি আর যুগান্তর দল, সবাই একই ভারতাত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। ভারতাত্মা কেন চিরজাগ্রত? ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রাচীনতম সমাজ, আজ সে নবীনতমও বটে। কী করেছিলেন আমাদের পূর্বজরা, যা অন্য সব প্রাচীন সভ্যতা থেকে ভিন্ন পরিণতি দিয়েছে আমাদের? এর পেছনেও কি আছে কোনো সংগঠনের কাহিনি? সে কথা কি লেখা আছে ভারতের ইতিহাসে?

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস খুঁজে বাস্তব ঘটনাগুলোকে বার করে আনা এক অতীব কঠিন কাজ। আজ থেকে হাজার বছর আগে একাধিক বর্বর জাতি আক্রমণ করেছিল ভারতবর্ষ। তক্ষশিলা থেকে নালন্দা, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার তারা নির্বিচারে ভস্মীভূত করেছিল। সেইসব গ্রন্থরাজির সঙ্গে ভারতের ইতিহাস কতটা হারিয়ে গেছে, কে বলতে পারে? সেসময় ভারতের সন্ন্যাসী-ভিক্ষুরা প্রচুর পুঁথিপত্র লুকিয়ে পাচার করে দিয়েছিলেন তিব্বতে। আশা ছিল, পরে সেগুলো ফিরিয়ে আনা যাবে। কিন্তু ভারত স্বাধীন হতে হতে তিব্বত পরাধীন হয়ে গেল। সেসব পুঁথিপত্র ফিরিয়ে আনা এখন প্রায়-অসম্ভব। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বলতে আমাদের নির্ভর করতে হবে। বিভিন্ন পুরাণ আর লোকগাথার ওপর। কিন্তু পুরাণের গাথার সঙ্গে মিশে থাকে ভক্তি, আধ্যাত্মিকতা, কিছুটা অলৌকিকতাও। অথচ ইতিহাসকে হতে হয় বাস্তবনিষ্ঠ। এই কথাগুলো মাথায় রেখেই প্রাচীন ভারতে সংগঠনের ইতিহাস কোথায় লুকিয়ে আছে, তা অনুসন্ধান করতে হবে।

***

কৃষ্ণের জন্মকালীন সময়ে ভারতীয় সমাজ কেমন ছিল? চারিদিকে কংস আর জরাসন্ধের মতো অসংখ্য ব্যভিচারী রাজা, আর তাদের অত্যাচারে নিপীড়িত সাধারণ মানুষ, রাজশক্তির স্বৈরাচারে যাদের জীবন হয়ে উঠেছিল নরকতুল্য। সেই পরিস্থিতিতে বাসুদেব কৃষ্ণ দেশজুড়ে লোককল্যাণে নিবেদিত একরাট রাজশক্তি নির্মাণ করেছিলেন। সে ইতিহাস তো সবারই জানা। আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায়। কৃষ্ণের জন্ম-মুহূর্তের সেই রাত্রে কে খুলে দিয়েছিল বসুদেবের শিকল? কে খুলে দিয়েছিল কারাগারের দরজা? কে বসুদেব আর সদ্যোজাত কৃষ্ণকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিল যমুনার অপর পাড়ে? সেই মানুষগুলোর নাম ইতিহাসে লেখা নেই। কিন্তু তাঁরা সেদিন এক নয়া ইতিহাস রচনা করেছিলেন। কোন সংগঠনের অঙ্গ ছিলেন তাঁরা? কী ছিল সেই সংগঠনের নাম? কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা সেই রাতে জীবনের বাজি লাগিয়েছিলেন? কৃষ্ণজন্মের আগে থেকেই নিশ্চয় কোনো সংগঠন দেশজুড়ে কাজ করছিল, স্বৈরাচারী রাজশক্তির কবল থেকে দেশকে উদ্ধারের চেষ্টা করছিল। তারাই কৃষ্ণজন্মের সহায়ক হয়েছিল। যেহেতু সে সময় লোককল্যাণে নিবেদিত কোনো শক্তিশালী রাজা ছিলেন না, সেহেতু এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, সেই সংগঠন সম্পূর্ণভাবে সাধারণ মানুষের সংগঠন ছিল। এরকম আরো উদাহরণ খুঁজলে পাওয়া যাবে। পরশুরাম একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। সেকি তিনি একা করেছিলেন? যদি ধরে নিই একা একজনের পক্ষে একাজ অসাধ্য, তবে ধরে নিতে হবে পরশুরামের সঙ্গেও কোনো সংগঠন ছিল। আর সে সংগঠন ছিল রাজশক্তি-অনধীন এক

লোকসংগঠন।

শ্রীকৃষ্ণ 'সম্ভবামি যুগে যুগে' ঘোষণা করে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন— বিষ্ণু প্রতি যুগেই জন্মান। তিনি এক নন, অসংখ্য। চণ্ডীতেও কিন্তু একই কথা বলা হয়েছে, 'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি, তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম্।' তার মানে আদ্যাশক্তিও যুগে যুগে জন্মেছেন। শক্তির দশ রূপ, দশ মহাবিদ্যা। কালী, ভুবনেশ্বরী, কমলা, ভৈরবী, বগলামুখী, ষোড়শী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, তারা। এঁরা কি ভিন্ন ভিন্ন নারী, ভিন্ন ভিন্ন যুগে জন্ম নিয়ে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন? হয়তো এই ব্যাপারটা মহেশ্বরের ক্ষেত্রেও সত্যি? মহেশ্বরও যুগে যুগে জন্মেছেন? মহেশ্বরের সহস্র নাম, সে কি একজনের নাম, নাকি সহস্র ভিন্ন ভিন্ন যুগপুরুষের নাম? এই সহস্র যুগপুরুষ একত্রে মিলেমিশে কীভাবে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজ করতেন? কি ছিল তাঁদের সামূহিক রূপ?

শূন্য থেকে মহামানবের সৃষ্টি হতে পারে না, এটা যে কোনো সমাজ-বিজ্ঞানীই মানবেন। কোন সে সংগঠন সেই সুপ্রাচীনকালে মহাবিদ্যা মহাশক্তিদের সৃষ্টি করেছিল? কোন সংগঠন যুগে যুগে মহেশ্বরের জন্ম দিয়েছিল? কৃষ্ণের জন্ম মুহূর্তে কারা বসুদেবের সহায় হয়েছিল?

রাজশক্তি ক্ষণস্থায়ী, লোকশক্তি কিন্তু চিরজীবী। এই শক্তিকে চিনেছিলেন প্রাচীন ভারতের ঋষিরা। তাই রাজশক্তি থেকে দূরে থেকে জনগণকে শিক্ষিত ও সংগঠিত করাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। তাঁদের রাজপ্রাসাদে কম, গ্রাম-পাহাড়-বন-তপোবনে কাটতো বেশি। আমাদের গোটা বিশ্লেষণে এই ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আপাতত আমাদের বিশ্লেষণ থেকে তিনটে ধারণা বেরিয়ে এসেছে :

(১) বৃহৎ, পরিবর্তন-সক্ষম ও সমাজকল্যাণে নিয়োজিত লোকসংগঠনের মধ্যেই রয়েছে মানবসভ্যতার অগ্রগতির চাবিকাঠি।

(২) প্রাচীন ভারতে ওইরকম লোকসংগঠন ছিল, আর সেসব সংগঠনে যথেষ্ট শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ছিল এবং তারা সমাজ-পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা নিতো। কিন্তু সেই সংগঠনগুলোর নাম কি ছিল, তা আমরা জানি না।

(৩) শক্তি, মহেশ্বর, বিষ্ণু; এঁরা এক নন, অসংখ্য।

এই তিন ধারণা থেকে অনুমান করা যাচ্ছে কী, প্রাচীন ভারতের লোক-সংগঠনগুলোর নাম কি ছিল?

আমার ধারণা, যে সংগঠন কৃষ্ণ আর পরশুরামের অভিযানে সঙ্গী হয়েছিল, সেই সংগঠনকেও 'বিষ্ণু' বলা হোত। যুগে যুগে 'সংগঠন-বিষ্ণু' 'মানুষ-বিষ্ণু'র আবির্ভাবের পরিস্থিতি তৈরির জন্য কাজ করে যেত। মানুষ-বিষ্ণু আবার পরবর্তী যুগের সংগঠন-বিষ্ণুর জন্য রাস্তা তৈরি করে দিত।

ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান, এ ভারতের সনাতন বিশ্বাস। তাই এদের মানুষ হয়ে ওঠে ঈশ্বর। আবার সেই কারণেই মানুষের সংগঠিত শক্তির মধ্যেও আমরা দেখতে পাই বিরাট-পুরুষ সেই ঈশ্বরকে। আত্মার সমষ্টিই তো পরমাত্মা। তার মানে, লোকসংগঠন ঈশ্বরেরই প্রাকৃত রূপ। এই জাগ্রত লোকশক্তি, এই সংগঠিত সমাজের মধ্যেই আছে ভারতীয় সমাজের অমরত্বের রহস্য। প্রাচীনকালে ভারতের সংগঠিত সমাজের ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলোকেই শক্তি, মহেশ্বর, বিষ্ণুও ব্রহ্মা; এই চারটে নাম দেওয়া হয়েছিল। তাই এঁরা চিরঞ্জীবী, সর্বত্রগামী, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ আর লোকগাথাগুলোকে এই আঙ্গিকে দেখলে প্রাচীন ভারতে লোকসংগঠনের এক সমৃদ্ধ পরম্পরা আবিষ্কৃত হতে পারে।

***

কী হলো সেই সংগঠনগুলোর? কোথায় হারিয়ে গেল তারা? হয়ত ইতিহাসের কোনো বাঁকে, কোনো অজানা কালখণ্ডে ওই সংগঠনগুলোর এক এক করে মৃত্যু হয়েছিল। সংগঠনের মৃত্যু হয় পরম্পরার মৃত্যু হলে, আর পরম্পরার মৃত্যু হয় সে পরম্পরার বাহকের মৃত্যু হলে। পৃথিবীর ইতিহাসের ভয়ঙ্করতম বহিরাক্রমণ আর গণহত্যা যে দেশ উপর্যুপরি যুঝেছে, সে দেশে অনেক কিছুই সম্ভব। একটা সময় থেকে ভারত যে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়েছে, এটা বাস্তব। তাই যে জাতি গ্রীকদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলো, সে হেরে গেলো বর্বর তুর্কী-মঙ্গোলদের কাছে। হয়তো ওই সংগঠনগুলোর মৃত্যুই ভারতীয় সমাজে অনৈক্যের ক্রমবৃদ্ধির কারণ।

অথচ ভারত-ইতিহাসের অন্ধকারতম সময়গুলোতেও লোকসংগঠনের পরম্পরা বারবার মাথাচাড়া দিয়েছে। অবন ঠাকুর রাজকাহিনিতে লিখেছেন, আলাউদ্দিন খিলজির সঙ্গে লড়াইয়ে চিতোরের দশ রাজকুমার যখন নিহত, সৈন্যবল সব শেষ, তখন শেষ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে একত্রিত হয়েছিল 'ভীষণমূর্তি ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ানি ফৌজ'। এ ঘটনা বারবার ঘটেছে। মালিক কাফুরের দাক্ষিণাত্য আক্রমণের সময় চাষি আর জেলেরা জায়গায় জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। পাহাড়ি মাওয়ালিরা মুঘল সাম্রাজ্যের শিকড় পুড়িয়ে দিয়েছিল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ তছনছ করে দিয়েছিল বাংলায় বিদেশি শাসনকে। তার মানে, ভারতআত্মা বারবারই পুনর্জাগরণের চেষ্টা করেছে। দাসত্বের সহস্র বছর দেশবাসী বিষ্ণুর আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করে এসেছে। ভেবেছিল, সে আকুল প্রার্থনা শুনে বিষ্ণু আকাশ থেকে নেমে আসবেন। কিন্তু বিষ্ণু আসেননি। তার মানে, আমাদের প্রার্থনার পদ্ধতিতে ভুল ছিল। বিষ্ণু আকাশ থেকে নেমে আসবেন না, তিনি এই মাটি থেকেই উঠে আসবেন। তাঁর সেই আবির্ভাবের পরিস্থিতি তৈরি করতে আমাদের সবারই কিছু ভূমিকা রয়েছে। আমাদের নিত্যদিনের কাজ দিয়ে সংগঠন-বিষ্ণুকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা সহস্র বছরের দাসত্ব আর ভয়ঙ্করতম গণহত্যার পরেও শুধু জীবিত আছে তাই নয়, আজ সে ধীরে ধীরে পৃথিবীর প্রবলতম অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হয়ে উঠেছে। এর একটাই মানে। লোকসংগঠনের প্রাচীন পরম্পরার পুনরুজ্জীবন ঘটছে। শক্তি, মহেশ্বর, বিষ্ণু, ব্রহ্মা জেগে উঠছেন। অন্য কোনো নামে, অন্য কোনো রূপে। ■

# বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে মিলন মেলা

প্রতিবারের মতো এবছরও ৮-১২ জানুয়ারি পাঁচদিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের মিলন মেলার আয়োজন করে বিবেকানন্দ পাঠচক্র উত্তর কলকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতি ও কালীসিংহী পার্কে। উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী বাগীশানন্দ

মহারাজ। যুব সম্মেলনে স্বামী তত্ত্বাতীতানন্দ স্বামীজীর জীবন ব্যাখ্যা করেন। মাতৃ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা, স্মিতা বক্সী, নীলাঞ্জনা রায় ও অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত। শারীরিক ক্রিয়া-কৌশল প্রদর্শন করে ক্রীড়া ভারতী। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় দু'শতাধিক স্কুল ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অমিয় কুমার মজুমদার স্মারক বক্তৃতায় অধ্যাপক সর্বানন্দ চৌধুরী 'স্বামীজীর সংগীত চর্চা ও ভাবনা'—বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ও সংগীত পরিবেশন করেন। ১১ জানুয়ারি কিংবদন্তী বংশীবাদক পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়াকে বিবেকানন্দ সংগীত সম্মান স্বরূপ রজতবংশী প্রদান করেন পাঠচক্রের পক্ষে স্বামী শিবময়ানন্দ। তবলাবাদক পণ্ডিত সমর সাহাকেও সম্মান জ্ঞাপন করা হয়। ১২ জানুয়ারি সকালে জাতীয় যুব দিবসে পাঠচক্রের সহযোগিতায় আয়োজিত হয় স্বামীজী স্মরণ পদযাত্রা।

সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের সভাপতি অসীম কুমার মিত্র। শেষে পরিবেশিত হয় নাট্যগীতি আলেখ্য 'তারামায়ের আদরের ছেলে বামাক্ষ্যাপা' সুর ও সঞ্চারীর উদ্যোগে।

মেলার মঞ্চে বিভিন্ন দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন পণ্ডিত ওসকার দাদরকর, পণ্ডিত সমর সাহা, রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য, সৃজা চক্রবর্তী, ত্রৈলী দত্ত, কৃষ্ণেন্দু পাল, সুচিত্রা ঘোষ, অরিজিৎ চক্রবর্তী, বিক্রমজিৎ দাঁ, শালিনী ঘোষ, সোহিনী ঘোষ, বিবেকানন্দ পাঠচক্র সংগীত গোষ্ঠী, সুরঙ্গনা, ঝামাপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ও সংস্কার ভারতীর নবদ্বীপ ও বেহালা শাখা। মিলনমেলা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তুষারকান্তি মজুমদার, কর্নেল সব্যসাচী বাগচী, সৌমেন ভোস, অলোক শেঠ, অরুণ ভট্টাচার্য, বিকাশ ভট্টাচার্য, গোপাল কুণ্ডু, সুভাষ ভট্টাচার্য, দাশরথি নন্দী প্রমুখ কার্যকর্তার পথ প্রদর্শনে। বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ তপন পাল, ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু, ভরত কুণ্ডু, সুদীপ দত্ত, পঙ্কজ ঘোষ, অরুণেন্দু দত্ত, গৌতম কুণ্ডু, শঙ্কর বাগ, হেনা দত্ত, ঋত্বিক কুণ্ডু প্রমুখ সদস্য-সদস্যার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই মিলন মেলা এক নতুন মাত্রা পায়। তত্ত্বাবধানে ছিলেন স্বামীজীর পৈতৃক বাসভবনের সন্ন্যাসী মহারাজগণ। অন্যতম সহযোগী ছিল সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ ও সিমলা ব্যায়াম সমিতি।

সমাবেশ সমাচার

# পরলোকে তবলা বাদক গজেন দাস

গত ১ জানুয়ারি ইহলোক ত্যাগ করেন সংস্কার ভারতীর মালদা শাখার সভাপতি তথা প্রবীণ তবলা বাদক গজেন দাস। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪। বারাণসীর প্রসিদ্ধ মনহর ঘরানার অন্যতম প্রতিভূ পণ্ডিত বিষ্ণুসেবক (বিষ্ণুজী) মিশ্রের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন তিনি। পাঁচ-এর দশক থেকে তিনি শুরু করেন তবলা বাদন চর্চা। পেশায় সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন, যার সঙ্গে সঙ্গীতের

কোনও যোগ ছিল না। কিন্তু অন্তরে ছিল সুর-ছন্দের আকুতি। বিষ্ণুজীর তালিমেই গঠিত হয় তাঁর বাদনশৈলী। গজেন দাসের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেছেন শিল্প জগতের ব্যক্তিত্বগণ। গজেন দাসের বাসভবনে তাঁর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান কণ্ঠশিল্পী বিনয় সরকার, জগন্নাথ দে, সুমিতা ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ চৌধুরী, চন্দ্রা পাল, সজল দত্ত, তবলা বাদক মৃণাল মুখার্জী, সেতার বাদক শুভঙ্কর দাস, গীটার বাদক তাপস চক্রবর্তী, কবি নির্মাল্য দাস-সহ মালদার বিশিষ্ট সংগীতশিল্পীগণ। গজেন দাস অনেক দেশাত্মবোধক ও মালদার নিজস্ব সংগীত গম্ভীরা গান রচনা করেন এবং সুর দেন। তাঁর লেখা গম্ভীরা গান এবছরে পশ্চিমবঙ্গের যুব উৎসবে প্রথম স্থান পায়। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আবাল্য স্বয়ংসেবক। তাঁর স্মরণে সাও কমপ্লেক্সে ১৯ জানুয়ারি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

# বীরভূম সংস্কার ভারতীর শিল্পী সম্মেলন

বীরভূম জেলার সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের সমন্বয়ে আয়োজিত হলো শিল্পী সম্মেলন। গত ১৩ ডিসেম্বর রবিবার সিউড়ির পাইকপাড়া সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশুমন্দিরে শিল্পী সম্মেলন আয়োজিত হলো বহুমুখী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

সকাল ৯টায় শিল্পীরা সম্মেলন স্থলে রঙ্গোলী ও আলপনার মাধ্যমে ও অলঙ্করণ প্রদর্শনে অংশ নেয়। পরে প্রদীপ প্রজ্বলন করে চিত্রপ্রদর্শনীর সূচনা করেন সংস্কারভারতীর পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সাধারণ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়। প্রদর্শনীতে শিল্পীদের হস্তশিল্প, চিত্রাবলী স্থান পায়।

বেলা ১০টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ভাবসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সম্মেলনে সূচনা হয়। এই পর্বে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে সম্মেলনের সূচনা করেন লোকসঙ্গীত সম্রাজ্ঞী স্বপ্না চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন নীলাঞ্জনা রায়, সুকুমার সেন, মানস চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রাঢ় বাংলার অন্যতম লোকশিল্পী, গীতিকার, সুরকার গায়ক রতন কাহারকে সম্বর্ধনা জানানো হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। মানপত্র, উত্তরীয়, শাল, ফল, মিষ্টান্ন, স্মারক গ্রহণ করে মুগ্ধ শিল্পী রতন কাহার বলেন, আমার মতো একজন পথচলতি মানুষকে সম্বর্ধনা জানানোয় সংস্কার ভারতীর প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ।

'সংস্কার ভারতীর উৎসব-আদর্শ-উদ্দেশ্য' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন সুকুমার সেন। পরে শাখা অনুসারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য গীতি আলেখ্য 'শ্রীচৈতন্য' পরিবেশিত হয়। তবে সম্মেলনে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে—'সংস্কার ভারতীতে আমাদের প্রাপ্তি' এই বিষয়ে 'মুক্ত চিন্তন' বিভাগে শাখার সদস্য- সদস্যাদের অভিব্যক্তি।

## অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের তিন দিনের ১৪তম রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গত ২৭ থেকে ২৯ ডিসেম্বর ব্যাঙ্গালুরুর শ্রীশ্রীরবিশঙ্করজীর আশ্রমে। অধিবেশনে সারা দেশ থেকে সাড়ে তিনহাজার প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। অধিবেশন উদ্বোধন করেন শ্রীশ্রীরবিশঙ্করজী। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপক মিশ্রা। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণ আইনজীবী কে. কে. বেণুগোপাল। সম্মেলনে দুর্গাপুরের স্বয়ংসেবক তথা সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী জয়দীপ রায়কে অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহসরকার্যবাহ ভাগাইয়াজী।

## দুর্গাপুরে সেবা বস্তিতে কম্বল দান

গত ৯ জানুয়ারি দুর্গাপুর সেবা বিভাগের ব্যবস্থাপনায় নীলডাঙা বস্তিতে কম্বল দান অনুষ্ঠান করা হয়। দরিদ্র বস্তিবাসীদের মধ্যে থেকে চয়ন করে তাদের হাতেই কম্বল তুলে দেওয়া হয় যাদের সত্যিই খুবই প্রয়োজন ছিল। গত ৬ মাস ধরে সেখানে একটি শিশু সংস্কার কেন্দ্র ও পাঠদান নিয়মিত চলছে। উক্ত কেন্দ্রের দিদিভাইরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে তাদেরই নাম পাঠান, যাদের উক্ত দিনে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। নগরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং সেবাভারতীর শুভাকাঙ্ক্ষী প্রতি বছর ২০-২৫টি কম্বল দিয়ে থাকেন এবং নিজের হাতে সবাইকে কম্বল তুলে দেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেবা সংস্থার সম্পাদক মলয় কালী এবং সেবা ভারতীর শুভাশিস মাজী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

# বিবেকানন্দ সেবা সম্মান

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে গত ১৭ জানুয়ারি বিবেকানন্দ সেবা সম্মানে ভূষিত করা হয় বিশিষ্ট সমাজসেবক তথা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার বাহক বিনায়ক লোহানীকে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। প্রধান অতিথি হিসেবে সজ্জন তুলসীয়ান এবং প্রধান বক্তা হিসেবে টেকনো ইন্ডিয়ার ডীন ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীলোহানীজীকে সম্মানস্বরূপ শাল, মানপত্র ও ১ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়ার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

# অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার জাতীয় সম্মেলন

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন যোজনার দশম জাতীয় সম্মেলন গত ২৪-২৬ ডিসেম্বরে কর্ণাটকের মহীশূরে অনুষ্ঠিত হয়। মাইশোর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর হিস্টরিক্যাল রিসার্চের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেট হলে এই জাতীয় সম্মেলনে উদ্বোধন করেন গোয়ার রাজ্যপাল শ্রীমতী মৃদুলা সিনহা ও কর্ণাটকের রাজ্যপাল ভজুভাই ভালা। 'ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহিলাদের ভূমিকা' শীর্ষক বিষয়কে কেন্দ্র করে এই আন্তর্জাতিক জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সমবেত হন বিশিষ্টজনেরা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক কে এস রঙ্গাপ্পা, অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার সর্বভারতীয় সেক্রেটারি ড. বাল মুকুন্দ পাণ্ডে , আর এস এস-এর সরকার্যবাহ শ্রী সুরেশ যোশী (ভাইয়াজী) প্রমুখ বিদ্বজ্জন, এবং পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ইতিহাসপ্রেমী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় সমাজের সংস্কৃতিতে মহিলাদের ভূমিকা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষকরা নিবন্ধ পাঠ ও পেপার সাবমিট বা প্রেরণ করেন। এবারের আলোচনায় নানা তথ্য উঠে আসে এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠানে হরিভাই ভাজু, ইন্দুমতি কাটডারে, ড. সরস্বতী মিত্তল, ডঃ বাল মুকুন্দ পাণ্ডে প্রমুখ তাদের বক্তব্যে সংস্থার ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড উপস্থাপন করেন। ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনা ভারতীয় মনীষার জাতীয়তাবাদের নিরিখে সঠিক ইতিহাসের পুনর্নির্মাণ কার্যে ব্রতী। হিন্দু ভারতের আধ্যাত্মিক পরম্পরায় সমৃদ্ধ এক সংগঠন। আর্য আক্রমণ তত্ত্ব, সরস্বতী নদীর গবেষণার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী শীর্ষক গবেষণা আগামীদিনে সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হতে চলেছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীনিবাস রাও।

# বেলডাঙ্গায় বিবেকানন্দ ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৪তম আবির্ভাব দিবসে বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে বেলডাঙ্গাবাসীর বহু প্রতীক্ষিত কার্যালয় বিবেকানন্দ ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়। সকাল ৮টায় প্রভাত ফেরির মধ্যে দিয়ে কার্যক্রমের সূচনা হয়। প্রায় ৩০০ জনের উপস্থিতিতে এই প্রভাতফেরি শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। বেলা ১০ ঘটিকায় সত্যনারায়ণ পুজো অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১১টায় ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন

সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী। এরপর স্থানীয় চৌধুরী বাড়িতে প্রায় ২৫০০ জন পংক্তি ভোজনে অংশগ্রহণ করেন। দুপুর ২ টায় স্থানীয় নেতাজী পার্কে শারীরিক ও বৌদ্ধিক কার্যক্রম হয়। কার্যক্রমে প্রায় ৩২০ জন স্বয়ংসেবক পূর্ণ গণবেশে অংশগ্রহণ করেন। কার্যক্রমে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ বাংলার প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী। শেষে বেলডাঙ্গা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। আশীর্বচন প্রদান করেন। কার্যক্রমে মায়েদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

# মুর্শিদাবাদ জেলায় দশদিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ শহরে গত ৮ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত দশদিবসীয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির হয়। রঘুনাথগঞ্জে তুলসীবাড়ি মন্দিরের পাশে যুবকসঙ্ঘে প্রতিদিন ২ ঘণ্টা করে অভিনব পদ্ধতি দ্বারা সংস্কৃত শেখানো হয়েছে। শিবিরে ১০ স্থান থেকে প্রতিদিন প্রায় ৩৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। শিবিরের উদ্বোধনে সংস্কৃত ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্তের প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক সমীরণ মাঝি উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষক ছিলেন সুমন্ত প্রামাণিক, শান্তনু দাস ও প্রশান্ত দাস। সর্বব্যবস্থা প্রমুখ ছিলেন অপর্ণা প্রসাদ চক্রবর্তী। গত ১৭ জানুয়ারি রবিবার সমাপ্তি কার্যক্রম দীপপ্রজ্বলনের মাধ্যমে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। এই কার্যক্রমে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গীপুর মহাবিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান অভিক সান্যাল। এছাড়া ছিলেন জঙ্গীপুর মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাক্তন অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত। সাম্য চ্যানেলের কর্ণধার কৌশিক দাস ও স্থানীয় এম. এস. কে বিদ্যালয়ের শিক্ষক সৌমেন কান্তি দাস। এই দিন শিবিরের ছাত্রছাত্রীরা দশদিনে যতটা শিখেছেন তা সংস্কৃতভাষাতেই অভিনয়ের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। শিবিরে আগত শিক্ষার্থীদের এত কম সময়ে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে দেখে আশ্চর্য হয়েছেন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা।

## কুটুম্ব প্রবোধনের সভা

গত ১৮ জানুয়ারি সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী খণ্ডের বদলপুরে একটি কুটুম্ব প্রবোধন সভার আয়োজন করা হয়। গ্রামের ২০টি পরিবার অংশগ্রহণ করে। হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু জীবন পদ্ধতি, পাশ্চাত্য ভাবধারা কেমন করে আমাদের জীবনপদ্ধতি কলুষিত করছে, সেখান থেকে আমাদের সংস্কৃতি কি করে রক্ষা করা যায়, ভারতীয় তথা সনাতন জীবনপদ্ধতি রক্ষা করার জন্য মায়েদের কত দিকে সচেতন থাকতে হবে—তার বিস্তারিত আলোচনা করেন প্রান্ত কুটুম্ব প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল।

## শোকসংবাদ

প্রদ্যোৎকান্ত বক্সী ছিলেন প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘ অব বেঙ্গলের প্রবীণতম সদস্য। গত ২রা জানুয়ারি তিনি চলে গেলেন ভোরের আলো ফোটার আগেই একান্ত নীরবে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। রেখে গেলেন তাঁর অশীতিপর, অশক্ত শয্যাশায়িনী স্ত্রীকে।

** *

সঙ্ঘের বোলপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক গৌরাঙ্গ রায়ের মাতৃদেবী কাজলরানী রায় গত ১২ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি দুই পুত্র, সাত কন্যা ও নাতিনাতনীদের রেখে গেছেন।

** *

গত ২৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রাজপুর সোনারপুরের বৈকুণ্ঠপুর শাখার স্বয়ংসেবক শম্ভুনাথ ঘোষের স্ত্রী বুলা ঘোষ ন্যাশনাল চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হসপিটালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি প্রায় এক বৎসর যাবৎ কিডনির রোগে ভুগছিলেন এবং ডায়ালিসিস চলছিল। তিনি রেখে গেলেন স্বামী, দুই পুত্র এবং এক পুত্রবধূ। তিনি ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্যর কনিষ্ঠা ভগিনী।

** *

মালদা জেলার মঙ্গলবাড়ি শাখার স্বয়ংসেবক তথা মালদহ নেতাজী সুভাষ রোডস্থিত সরস্বতী শিশুমন্দিরের আচার্য তাপস চক্রবর্তীর দিদিমা গত ৬ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী।

** *

গত ৬ জানুয়ারি মালদা জেলার চাঁচলের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা সুচিকিৎসক ডা. বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি ৪ পুত্র ও পুত্রবধূ, ১ কন্যা, নাতিনাতনিসহ বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি দীর্ঘদিন চাঁচল মহকুমা সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

** *

কোচবিহার শহরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সহ সভাপতি ডা. মণীন্দ্র পালের সহধর্মিনী চারুপ্রভা পাল গত ১১ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি দুই পুত্র ও বহু গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন।

** *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলা সঙ্ঘচালক খগেন্দ্রনাথ রায় গত ১৫ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা ও নাতিনাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি শৈশবেই কলকাতায় স্বয়ংসেবক হয়েছিল। সকলকে আপন করাই ছিল তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য।

# সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে

**জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

স্বদেশে ডিজাইনার পিচ বানিয়ে বিদেশি দলকে ঘোল খাওয়ানো আর বিদেশে যথার্থ স্পোটিং উইকেটে গিয়ে ধরাশায়ী হওয়া, এই চিত্রনাট্যের কোনো বদল হলো না। দুনিয়ার অনেক কিছুই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেলেও ভারতীয় ক্রিকেট টিমের এই চালচিত্র কিন্তু একই জায়গায় রয়ে গিয়েছে। সাম্প্রতিক অস্ট্রেলিয়া সফরে একদিনের ক্রিকেটে শক্তিশালী দল হয়েও যেভাবে ভারত ম্যাচের পর ম্যাচ (একটি ওয়ান ডে ছাড়া) বিধ্বস্ত হয়েছে তা কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে যথেষ্ট চিন্তায় রাখছে ক্রিকেট প্রেমীদের। অবশ্য মার্চে দেশের মাঠে মোটামুটি গরম আবহাওয়ায় স্লো-টার্নিং পিচেই খেলা হবে। তবে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সুযোগ সুবিধে ও বিশেষ ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ভারতীয় ক্রিকেটাররা আবার চেনা ছন্দে আত্মপ্রকাশ করবে।

বছরের পর বছর, এই ঘটনা চলে আসছে। এর কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা যে কয়েকটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন তা হলো দেশের সমস্ত ঘরোয়া টুর্নামেন্ট বোলার-ব্যাটসম্যান উভয়কেই সাহায্য করে এমন উইকেটে খেলা হোক। পিচ যেন তিনদিন বা চারদিন একইরকম আচরণ করে। জাতীয় ক্রিকেটের আঁতুরঘর যে বেঙ্গালুরুর আকাদেমি সেখানে ফাস্ট বোলার তৈরির ক্ষেত্রে বাড়তি চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। কারণ বিদেশে সর্বত্রই পেস ও বাউন্স ভরা উইকেটে বল করতে হয় ভারতীয় পেসারদের। দেশে স্লো এবং লো বাউন্সের উইকেটে যে ধরনের লাইন-লেংথ রেখে বল করতে হয় তা কিন্তু বিদেশের উইকেটে চলবে না। সুইং, কাট, পেস সব কিছুরই ভ্যারিয়েশন করতে হয়। তাই দেশে উইকেটের চরিত্র আমূল বদলে ফেলা দরকার। তাতে শুধু বোলাররাই নন, ব্যাটসম্যানদের টেকনিক, স্কিল আরও মজবুত হবে। যদিও এবারের অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যাটসম্যানরা নিজেদের প্রয়োগ ক্ষমতা দেখাতে পেরেছে। তবে ভুললে চলবে না অস্ট্রেলিয়া কিন্তু তাদের নিয়মিত বোলারদের খেলায়নি বা সার্ভিস পায়নি ইনজুরি সমস্যার জন্য।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত স্কুল ও ক্লাব ক্রিকেটে আরও বেশি করে দীর্ঘমেয়াদি ক্রিকেট চালু করার। টি-২০ এবং ৫০ ওভারের ম্যাচের পাশাপাশি লং ফর্মাটের খেলার সংখ্যা বাড়লে বেসিক স্কুলিংটা ভালো হবে উঠত ক্রিকেটদারদের। পরে তারা বৃহত্তর ক্রিকেট পরিসরে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সার্কিটে লড়লে লড়াই দেওয়ার মতো জায়গায় থাকবে। সেজন্য বোর্ডের উচিত অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মডেল অনুসরণ করা। সাম্প্রতিককালে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডই সবচেয়ে সফল দল যারা দেশে ও বিদেশে সমানভাবে তুল্যমূল্য সাফল্য পেয়েছে। তাই এদেশের সব শ্রেণীর সব পর্যায়ের ক্রিকেটে চালু গঠনতন্ত্র ও কাঠামোর আমূল সংস্কার করতে হবে। সুনীল গাভাসকার, কপিল দেবের আমলে ভারত প্রথম বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংল্যান্ডের মাটিতে শক্তিধর ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে। তারপর থেকেই ক্রিকেট নিয়ে এদেশে মাতামাতি আন্তর্জাতিক স্তরে চলে যায়। সেই অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বিসিসিআই ক্রিকেটকে 'সেলেবেল কমোডিটি' হিসেবে তুলে ধরে। বাণিজ্যিক সংস্থারাও এগিয়ে আসে নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য।

এখন ভারতীয় বোর্ড সবচেয়ে ধনী এক সংস্থা যারা কিনা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলকেও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এদেশে খেলতে আসা বিদেশি দলগুলো বিসিসিআইয়ের সমস্ত রকম সুযোগসুবিধে পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে। তার প্রভাব পড়ে মাঠের ম্যাচেও। কিন্তু বিদেশে নিজেদের পরিচিত পরিবেশে, সমস্ত রকম চাপ ও প্রতিকূলতার বাইরে থেকে খেলতে পারে। তাই ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের হোম অ্যাডভান্টেজ কাজে লাগিয়ে ভারতকে কচুকাটা করে। বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন দরকার। নচেৎ বিদেশে মুখ পুড়িয়ে আসার পরম্পরা চলতেই থাকবে। অজিত ওয়াদেকারের নেতৃত্বে বিদেশে হেভিওয়েট প্রতিপক্ষকে হারিয়ে টেস্ট সিরিজ জেতার যে রাস্তা তৈরি হয়েছিল, সেই রাস্তায় সাফল্যের সঙ্গে পদচারণা করে গেছেন গাভাসকার, মাহিন্দর অমরনাথ, কপিল দেব হয়ে হাল আমলের শচীন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গাঙ্গুলিরা। তাদের উত্তরসূরী হিসেবে মহেন্দ্র সিং ধোনি ও বিরাট কোহলির টিম ইন্ডিয়াও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য জয় পেয়েছে বিদেশের মাটিতে। কাজেই বিদেশে অসাফল্যের চাবিকাঠি খুঁজতে গেলে কর্মকর্তা থেকে ক্রিকেটার, প্রত্যেককে নিজের মোড এবং মডিয়ুল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অদল-বদল করতে হবে। ■

**শব্দরূপ-৭৭৬** ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

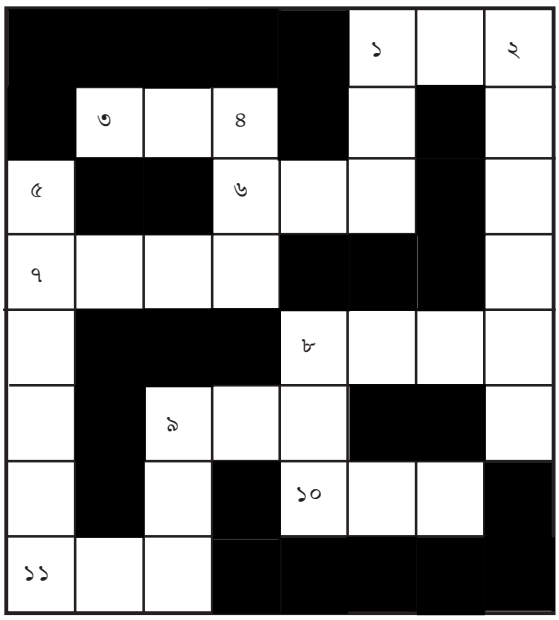

**সূত্র :**

**পাশাপাশি : ১.** 'তুমি —, তাহা বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?' **৩.** জোনাকি, **৬.** সঞ্চিত, বর্তমান, **৭.** যে সময়ে বিবাহ পূজা ইত্যাদির অনেক লগ্ন পড়ে, **৮.** কাগজে সংলগ্ন মাছি পর্যন্ত নকল করে এমন নির্বোধ ('— কেরানি'), **৯.** বৈদ্যকশাস্ত্রকার বিশেষ ('— সংহিতা'), **১০.** নিরীশ্বরবাদী; বেদে বা শাস্ত্রোক্ত ধর্মে অবিশ্বাসী, **১১.** তাঁতের মাকু।

**উপর-নীচ : ১.** অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম, **২.** সংসারে অনাসক্তির ভান করে ভণ্ডামি, **৪.** রামায়ণোক্ত নদী বিশেষ; অন্ধকার, **৫.** বংশপরিচয়ে যেখানে গাঁই-গোত্রের কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই, **৮.** গজদন্তহীন পুং হস্তী, **৯.** চালাক, ধূর্ত।

**সমাধান**
**শব্দরূপ-৭৭৩**
**সঠিক উত্তরদাতা**

**শৌনক রায়চৌধুরী**
**কলকাতা-৯**
**সুশীল কয়াল**
**কলকাতা-৬**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্র | স্থা | গা | র | ■ | ন | ন্দ | ন |
| স্থ | ■ | ল | শ | ক | র | ■ | হ্ব |
| কা | শ | ■ | না | ল | ক | ■ | ষ |
| র | ক্তি | ম | ■ | হ | বা | ■ | ■ |
| ■ | ■ | গ | বা | ■ | স | ন | দ |
| জ | ■ | রা | তু | ল | ■ | হ | স্ত |
| লৌ | ■ | হা | ল | খা | তা | ■ | খ |
| কা | ম | ট | ■ | ই | মা | র | ত |

*শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।*
*খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।*

□ ৭৭৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সংখ্যায়

## লেখক-লেখিকাদের প্রতি

□ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

□ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

□ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

□ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

□ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

□ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

□ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

□ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

□ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

□ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

# ।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ১৪

# মন্দির উন্নয়নের কাজ শুরু করবে সপা সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি।।** উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন হতে এখনও প্রায় এক বছর বাকি। কিন্তু তার আগেই মাঠে নেমে পড়ল সমাজবাদী পার্টির সরকার। উন্নয়নের ক্ষেত্রে অখিলেশ সরকার এবার এক নতুন উদ্যোগ নিচ্ছে। রাজ্যের ধর্মীয় স্থানগুলি উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করতে তৎপর সপা সরকার। এক্ষেত্রে হিন্দু মন্দিরগুলির দিকেই সরকার প্রথমে নজর দেবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশে যে সমস্ত মন্দির রয়েছে সেগুলির তত্ত্বাবধানে রয়েছে অছিপরিষদ সপা সরকারের ধর্মসংক্রান্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় অন্ততপক্ষে একটি মন্দিরের উন্নতি সাধন করা হবে। প্রতিটি জেলা শাসকের কাছ থেকে বিখ্যাত মন্দিরগুলির বিশদ তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে। মন্দিরগুলি পরিদর্শনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে মেলার আয়োজন হয়ে থাকে সেদিকেও সরকার নজর দিয়েছে। তবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুধু হিন্দু মন্দিরই নয়, মুসলমান তীর্থস্থানগুলিকেও প্রাধান্য দিচ্ছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব নবনীত সেহগল বলেন, ‘‘৩৪ টি জেলা থেকে মন্দির উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব আমরা পেয়েছিলাম। তাই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্দিরসহ অন্যান্য ধর্মীয় স্থানগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় পর্যটন বাড়ানোর ক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীদের কথা মাথায় রেখে কাজ করবে সরকার।’’ সূত্র মারফত জানা যায়, সরকার ধর্মীয় স্থানগুলিতে যাতায়াতের জন্য সরকারি বাস চালাবে, এছাড়াও উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার, শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা, তীর্থযাত্রীদের জন্য থাকার জায়গার ব্যবস্থা করা হবে। মুখ্যসচিব সেহগল আরও জানান ‘২০১৬-১৭ বাজেটে এজন্য অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা

হবে। তারপর উন্নয়নের কাজ শুরু হবে।’

সমাজবাদী স্বর্ণ যাত্রার জন্য তীর্থযাত্রী এবং পবিত্রস্থানগুলির জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকার ভরতুকি দেবে। এছাড়া সরকারের অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে অযোধ্যায় চৌরাশি কোশি পরিক্রমার জন্য রাস্তায় পবিত্র পারিজাতের চারা লাগানো, মথুরায় বিশ্বের সর্বোচ্চ মন্দির তৈরির শিলান্যাস করা হয়েছে। অযোধ্যায় তীর্থযাত্রীদের ভজন সন্ধ্যার জন্য একটি প্রেক্ষাগৃহ গড়ে তোলা হবে, গোবর্ধন-এ রুদ্রকুণ্ডের উন্মোচন করা হবে, কৈলাশ মানসসরোবরে তীর্থযাত্রীদের জন্যে আরও ৫০ হাজার টাকা অনুদান বাড়ানো হবে, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের পরিকাঠামোর উন্নতি করা হবে এবং বারাণসীতে নতুন ঘাট তৈরি করা হবে।

## পরীক্ষা পাশ ছাড়াও পড়ার গুরুত্ব অসীম

**নিজস্ব প্রতিনিধি।। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে দিনে মাত্র ৬ মিনিট কোনো ভাল বই পড়তে পারলে (১) পেশীর টান কমে, (২) হৃদস্পন্দনও স্বাভাবিকের দিকে যায়। শুধু তাই নয়, উদ্বেগ, ক্লান্তি কমাতে গান শোনার থেকে ৬৮, চা পানের থেকে ১০০, হাঁটার থেকে ৩০০ বা ভিডিও গেম খেলার থেকে ৭০০ শতাংশ বেশি কাজ করে পুস্তক পাঠ। গবেষকরা জানান মনযোগী পাঠে (১) স্মৃতিশক্তি তরতাজা হয়, (২) শব্দ ভাণ্ডার বাড়ে, (৩) ডিমেনশিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাকেও কিছুটা বাগে আনা যেতে পারে এবং (৪) ঘটনা বিশ্লেষণের দক্ষতা বাড়ায়। সবচেয়ে মজার কথা, বইয়ের কাল্পনিক চরিত্রদের নানান ভুল ভ্রান্তি বাস্তব জীবনে শুধরে নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। আর ছাত্র ছাত্রীদের মনোসংযোগ বাড়া তো আছেই। বই তাহলে শুধু বুদ্ধিবৃত্তি নয়, শরীরের পক্ষেও স্বাস্থ্যকর।**

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
1 February - 2016 - Rs. 10.00

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!